

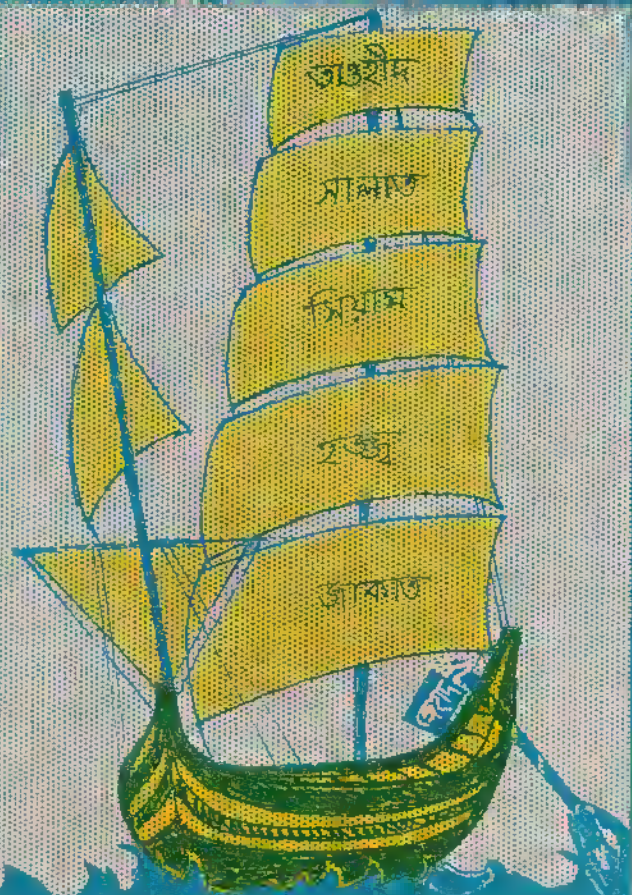
মেম্বারশীপ ১৯৯৩

মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ মুসলিম বিশ্বঃ
ইসলামের বিজয় কোন পথে?
মধ্য প্রাচ্য সমস্যার
সমাধান কোথায়?
আধুনিক সভ্যতার স্বর্ণ সোপান
যাদের হাতে গড়া
ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার
শ্রেষ্ঠত্বের যৌক্তিকতা



মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

প্রতিষ্ঠাতা:

শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী (রাহঃ)

দ্বিতীয় বর্ষ ৫ম সংখ্যা

১৯ মাঘ-১৩৯৯

৮ শাবান-১৪১৩

১ ফেব্রুয়ারী -১৯৯৩

পৃষ্ঠপোষক:

কমাণ্ডার মনজুর হাসান

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা:

উবায়দুর রহমান খান নদভী

সম্পাদক:

মুফতী আব্দুল হাই

নির্বাহী সম্পাদক:

মনজুর আহমাদ

সহসম্পাদক:

হাবিবুর রহমান খান

মুফতী শফিকুর রহমান

মূল্য : ৭ (সাত) টাকা মাত্র

যোগাযোগ:

সম্পাদক জাগো মুজাহিদ

বি/৪৩৯, তালতলা,

খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

ফোনঃ ৪১৮০৩৯

অথবা

জি, পি, ও বক্স নম্বরঃ ৩৭৭৩

ঢাকা-১০০০

সূচী পত্র

* পাঠকের কলাম	২
* সম্পাদকীয়	৩
* জিহাদঃ মুসলিম জীবনের গৌরবময় অধ্যায়	
প্রিন্সিপাল এ, এফ, সাইয়েদ আহমাদ খালেদ	৫
* মাহে শাবান ও শবে বরাতের ফজ্রিলাত	
আমীনুল ইসলাম ইসমতী	৮
* ক্বজা বিক্ষুব্ধ মুসলিম বিশ্বঃ ইসলামের বিজয় কোন পথে?	
আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	১০
* মধ্য প্রাচ্য সমস্যার সমাধান কোথায়?	
ইবনে বতুতা	১৪
* আমার দেশের চালচিত্র	
মুহাম্মাদ ফারুক হুসাইন খান	১৭
* আধুনিক সভ্যতার স্বর্ণ সোপান যাদের হাতে গড়া	
মোঃ আঃ আহাদ	১৯
* ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের যৌক্তিকতা	
মাওলানা হিফজুর রহমান	২২
* আমরা যাদের উত্তরসূরী	
ইমাম বোখারী (রাহঃ)	২১
মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন	২৬
* কবিতা	২৮
* প্রশ্নোত্তর	২৯
* নবীন মুজাহিদদের পাতা	৩৩
* আপনার চিঠির জবাব	৩৭
* বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা	৩৮



“লেখকের কথা”র প্রতিবাদ

(১)

জনাব সম্পাদক সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনার মাসিক জাগো মুজাহিদ পত্রিকার ১৯৯২ সনের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যায় পাঠকের কলামে “লেখকের কথা” শিরোনামে লেখক জনাব জসিম উদ্দিন খান পাঠান সাহেবের প্রকাশিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নেত্রকোনা শাখা কর্তৃক প্রকাশিত মরহুম মৌঃ মনজুরুল হক সাহেবের প্রকাশিত জীবনী মূলক প্রবন্ধ থেকে লেখক তাঁর লেখায় মরহুম মৌঃ আলীম উদ্দিন সাহেবকে নেত্রকোণা শহরস্থ বড় মসজিদ এবং আঞ্জুমান আদর্শ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নেত্রকোনা শাখা কর্তৃক সংগৃহীত মাওলানা মনজুরুল হক সাহেবের জীবনীতে তথ্য প্রদানকারীর অসবধানতার কারণে তাঁর জীবনী ও কার্যাবলীতে মরহুম মৌঃ আলীম উদ্দিন সাহেবকে নেত্রকোনা শহরস্থ বড় মসজিদ ও আঞ্জুমান আদর্শ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উল্লেখ করে ভুল তথ্য লেখা হয়। পরবর্তীতে এই বিষয়টির ব্যাপারে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার পরিবারের নিকট থেকে তথ্য সংশোধনের পত্র প্রাপ্তির পর প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন নেত্রকোনা শাখা বিগত ২২-১০-৯২ইং তারিখে মরহুম মাওঃ মনজুরুল হক সাহেবের জীবনীতে উল্লেখিত ভুল তথ্য সংশোধন করা হয়।

সুতরাং, অত্র বিষয়টি আপনার পত্রিকায় পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ ও প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মুহাঃ রেজাউল কাম

উপ-পরিচালক,

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নেত্রকোণা।

(২)

জনাব সম্পাদক সাহেব,

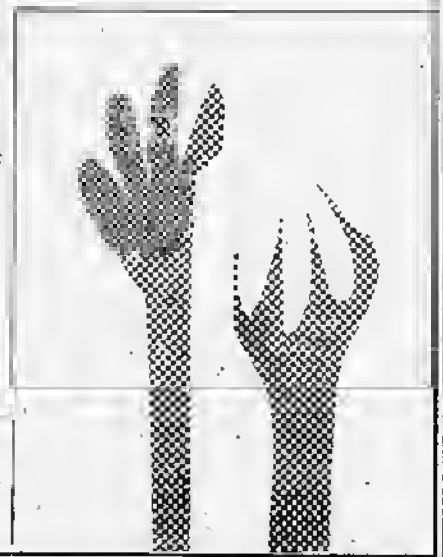
আসসালামু আলাইকুম,

আপনার মাসিক জাগো মুজাহিদ পত্রিকার ১৯৯২ সনের ডিসেম্বর সংখ্যায় পাঠকের কলামে মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা মনজুরুল হক (রাহঃ) প্রসঙ্গে লেখকের একটি লেখা “লেখকের কথা” শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত লেখায় জনাব জসিম উদ্দিন খান পাঠান সাহেব উল্লেখ করেন যে, “উপরন্তু আমাদের জানামতে মাওলানা আলীম উদ্দিন সাহেব ছিলেন নেত্রকোনা বড় মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা—।” কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাওলানা আলীম উদ্দিন সাহেব নেত্রকোনা শহরস্থ জামে মসজিদ বা বড় মসজিদের ইমাম ছিলেন। নেত্রকোনার মুসলিম শিক্ষার দিশারী, তৎকালীন লোকাল বোর্ডের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে নেত্রকোনা লোকাল বোর্ডের আজীবন চেয়ারম্যান, নেত্রকোনা পৌরসভার প্রথম মুসলমান ডাইস চেয়ারম্যান, নেত্রকোণার খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ও খ্যাতিমান উকিল মবহুম মৌঃ এলাহী নেওয়াজ খান বি, এল সাহেব ছিলেন নেত্রকোনা জামে মসজিদ বা বড় মসজিদের উদ্যোগী প্রতিষ্ঠাতা। নেত্রকোনা জামে মসজিদ বা বড় মসজিদটি আজ থেকে প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মসজিদটি শহরের প্রথম মসজিদ। বর্তমানে যে স্থানের উপর মসজিদটি অবস্থিত তার মালিক ছিলেন গৌরীপুরের জমিদার বাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। সে সময়ে শহরে কোন মসজিদ না থাকায় মৌঃ এলাহী নেওয়াজ খান সাহেব মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বর্তমান স্থানটিতে মসজিদ স্থাপনের জন্য জমিদার নিকট এক আবেদন পেশ করলে জমিদার মসজিদের জন্য স্থানটি দিতে অস্বীকার করেন। ফলে এলাহী নেওয়াজ খান

তৎকালীন বিরাজমান প্রতিবৃদ্ধ পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ সাহেবের সাথে যোগাযোগ করেন। মৌঃ এলাহী নেওয়াজ খানের যোগাযোগের প্রেক্ষিতে ঢাকার নবাব সাহেব ঢাকা শহরে তার এক খন্ড ভূমি গৌরীপুরের জমিদারকে প্রদান করে মসজিদের স্থানটি তাঁর (নবাব সলিমুল্লাহ) নিজের নামে নিয়ে মসজিদের জন্য তা দান করেন। নবাব সাহেবের দানকৃত ভূমির উপর মৌঃ এলাহী নেওয়াজ খান সাহেবের বলিষ্ঠ ভূমিকার ফলে তৎকালে একটি ছোট মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালক্রমে মুসলিম জনগণের আর্থিক সাহায্যে সেই ছোট মসজিদটির কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এই মসজিদটি নেত্রকোনা শহরে বড় মসজিদ বা জামে মসজিদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

অত্রাবস্থায় উল্লেখিত বিষয়টি আপনার পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশকরার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আলহাজ্ব মৌঃ মোঃ হুসাইন
ইমাম
জামে মসজিদ, নেত্রকোণা।



জাতিসংঘ নামক শয়তানের আড্ডাটি ভেঙ্গে দেয়ার এই সময়

বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত চাঁদা ও সহযোগিতায় যে বিশ্ব পঞ্চায়েতটি দীর্ঘদিন যাবত দুনিয়ার মানুষের আশা আকাংখার প্রতীক (?) রূপে মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে সেই জাতিসংঘ, UNITED NATIONS এর অবস্থা এখন একটি বিশালকায় দানবের মরা লাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতিসংঘের সদর দফতর আমেরিকার নিউইয়র্কে; এটি যেমন এর পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার পয়লা কারণ ঠিক তেমনি এর কয়েকটি স্থায়ী সদস্যের সীমিতরিক্ত দাপাদাপি আর ন্যায়-ইনসাফ ও মানবতা বিরোধী ডেটো পাওয়ারও মানব জাতির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা লজ্জাকর রীতি।

সত্য পৃথিবীর শিক্ষিত জাতিসমূহের নন্দিত সংঘ তার ইদানিংকার কিছু ভূমিকায় তথাকথিত পরাশক্তি ও তাব দোসর মিনি সুপার পাওয়ার গুলোর "গৃহপালিত পঞ্চায়েত বা রাবারস্ট্যাম্প প্রতিষ্ঠান" হিসেবে বিশ্বের সাহসী চিন্তা ও মুক্ত চেতনার মানুষের সামনে নিজেকে উপস্থাপিত করেছে। জাতিসংঘের আসল চেহারা উন্মোচিত হওয়ার এককালের আশ্বাতজন এ প্রতিষ্ঠানটি যে সবসময়ই কাণ্ডে বাঘই ছিল তা-ও আজ বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারত বিভাগ থেকেই শুরু করা যাক। কাশ্মীরী জনতার প্রাণের দাবী "বান্ধগ্যবাদী শাসনের আওতামুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র ইসলামী হকুমত কায়ম করা" তা আজ পর্যন্ত ঐ জাতিসংঘের প্রস্তাবের ফাইলেই আটকা পড়ে আছে। জাতিসংঘ যদি নিরপেক্ষ, ন্যায়-নিষ্ঠ বা প্রভাবশালী কোন প্রতিষ্ঠান হতো তাহলে তাব প্রস্তাবের অবমাননা করে হিন্দুস্তানের শাসকগোষ্ঠী নির্বিচারে কাশ্মীরী মুসলমানদের রক্তে ভূষণ রঞ্জিত করতে পারতো না। বরফ ঢাকা রূপসী উপত্যকায় ছিন্নভিন্ন হয়ে খসে পড়তো না মা-বোন ও মেয়েদের সন্তানের পবিত্র আঁচল। ভারতীয় বাহিনীর পাশবিকতা আর জল্পপনার শিকার হয়ে জ্বলে পুড়ে থাক হতো না পৃথিবীর বেহেশত বলে কথিত কাশ্মীর।

আরব ভূখণ্ড ফিলিস্তিনের পবিত্র ও বরকত পূর্ণ মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হলো শত সহস্র আরব আবাব-বুদ্ধ-বনিতা। মুসলমানের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকদাস ইহুদীদের হাতে অগ্নিদগ্ধ আর অব্যাহত অবমাননার শিকার। পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় প্রতিদিন মুসলমানের রক্ত করে। সত্যতার ইতিহাসে কলংক হয়ে আছে সাবরা-শতিলার হত্যাকাণ্ড। কিন্তু জাতিসংঘ নামক শেতহস্তীটি এখানে সীমাহীন অসহায়। ইহুদী-জায়েনবাদ আর ইসরাইলের ব্যাপারে জাতিসংঘের মুখে "তেটো" নামক কুলুপ আঁটা।

সুন্দর একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া দেশনেতা মোয়াম্মার গাদ্দাফী। আমেরিকার দাগাগিরি মানতে তিনি একটু ইতস্ততঃ করেন। স্বাধীনতা ও মুক্তির পূর্ণাঙ্গ অর্থটি তিনি জানেন। তিনি লিবিয়ার মানুষকে একটি গর্বিত আরব দেশের মাথা উঠু জাতি হিসেবে পরিচিত কররাতে চান। স্বাবলম্বী দেশের স্বর্ণভর মানুষ নিয়ে গড়ে তুলতে চান সুন্দর একটি লিবিয়া। কিন্তু মার্কিনীরা তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে চায়। বলে, তিনি নাকি সন্ত্রাসী। পরাশক্তির চোখ রাঙানীর পরোয়া না কালেই "সন্ত্রাসী" হিসেবে আখ্যা পেতে হয়। একটি বিমান দুর্ঘটনার সাধে জড়িত থাকার অপ্রমাণিত "অপরাধে" লিবিয়ার দুইজন নাগরিককে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়া না দেয়ার জেদাজেদী নিয়ে মার্কিনীরা লিবিয়ার উপর অবরোধ আরোপ করে বসে। জাতিসংঘ নামক প্রতিষ্ঠানটি এখানেও তুটো জগ্নাথ।

উপসাগরীয় সংকটে কুয়েত দখলের অপরাধে যে পরিমাণ শাস্তি ইরাকের মানুষ পেলে এবং এখনো পাচ্ছে সে সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা আর অবরোধে ইরাকী জনতা আজ 'ওঠাগত প্রাণ। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ষ্টিমরোলারের চাকা ঘর্ষর করে এগিয়েই চপছে। এক সাদামের অংশের সাজা ভাগ করতে হচ্ছে কোটি কোটি মুসলমানকে। ইরাক-কুয়েত ছাড়াও আরব আমীরাত, সউদী আরব সবাইকে গুণতে হচ্ছে মোটা অংকের গুণ্ডা ফিস। "ঘাদানি" আর কারে কয়?"

অথচ বিশ্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও নির্মম পশুত্বের নির্লজ্জ মহড়া চপছে পূর্ণ ইউরোপে। সুসভ্য পরিশীলিত আর জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত পাচাত্যের মানুষেরা কী কাণ্ডটাইনা করছে। খৃষ্টান জাতির মাথা নুয়ে গিয়ে হাটুতে লাগার মতো ঘটনা। আমি বলছি বসনিয়া হারজেগোভিনার কথা। যেখানে দেড় লক্ষ উম্মতে মোহাম্মাদীকে কুপিয়ে, পিটিয়ে, নদীতে ডুবিয়ে, পানিতে চুবিয়ে, গুলির মুখে খতম করে দেয়া হয়েছে মাত্র ৭/৮ মাসের মধ্যে। ৪০ সহস্রাধিক মুসলিম মা বোনের পবিত্র ইচ্ছাতের চাদর ছিন্ন তিন্ন করেছে খৃষ্টান জানোয়ারেরা। নির্বাতনের মাধ্যমে গর্ভসঞ্চার করে বসনিয় মায়েদের বলা হচ্ছেঃ "সার্ব অর্থডক্স খৃষ্টানদের বংশবৃদ্ধি করা।" লক্ষ লক্ষ মুসলিম এখনো সার্ব বনী শিবিরের নারকীয় পরিবেশে ধুকে ধুকে মরছে। কিন্তু নীরব জাতিসংঘ। বেকার এর পরিষদ সমূহ। শয়তানের আড্ডাটির যেন কোন কিছুই করার নেই।

মুসলমানকে মারার সুযোগ পেলেই জাতিসংঘের কার্যক্রম শুরু হয়। আর মুসলমান মার খেলে জাতিসংঘ নিথর হয়ে পড়ে। এ বাস্তব সত্যটি দেখে শুনে বুঝেও কি পৃথিবীর মুসলিম নেতৃবৃন্দের স্মৃতি হবে না? এরা কি খুনীর দুয়ারে বিচার চাইতে লাইন দিয়ে বসে থাকবে চিরদিন। ওরা কি পিতৃ হত্যা, ভাতৃঘাতক আর মা-বোন-কন্যার শ্রীলতা নাশক পশুদের হাতেই নিজেদের অশ্রু মোছাতে আগ্রহী? এ আশা কি কোনদিন পূরণ হবে?

না, হবে না। কোনদিনও না। অতএব, সময় থাকতে শয়তানের এ বৃহৎ আড্ডাটিকে ভেঙ্গে দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পৃথক একটি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মোচন হতে হবে আর তা অবিলম্বে এখনই।

নিয়মাবলী

- ❶ ইসলামী আদর্শ ও নীতির পরিপন্থী নয় এমন যে কোন প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি গৃহীত হবে। তবে মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় জিহাদরত এবং যে কোন দেশের ময়লুম ও নিগৃহীত মুসলমানদের ওপর তথাপূর্ণ, পর্যালোচনামূলক ও গবেষণালব্ধ লেখা প্রাধান্য পাবে।
- ❷ কাগজের এক পিঠে পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে।
- ❸ কোন লেখা ছয় মাসের মধ্যে ছাপা না হলে তা অমনোনীত বলে বুঝতে হবে।
- ❹ অমনোনীত লেখা ফেরৎ পেতে হলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাতে হবে।

গ্রাহক:

- ❶ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক হওয়া যায় না।
- ❷ প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে 'জাগো মুজাহিদ' প্রকাশিত হয়।
- ❸ পত্রিকা ডাক যোগে পাঠান হয়।

গ্রাহক টাঙ্গা:

- ❶ প্রতি সংখ্যা সড়াক ৭.০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যার দাম ভিন্ন।
- ❷ বার্ষিক- ৪২.০০ টাকা
- ❸ বার্ষিক- ৮৪.০০ টাকা

এজেন্ট:

- ❶ পাঁচ কপির কম এজেন্ট করা হয় না। ৩০% কমিশন দেয়া হয়।
- ❷ শতকরা ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ❸ প্রয়োজনীয় সংখ্যা সম্পর্কে পূর্বে অবহিত করলে ডি. পি. যোগে তা পাঠান হয়।

বিজ্ঞাপনের হার:

৪র্থ কভার	৫০০০/- টাকা
২য় কভার	৩০০০/- "
৩য় কভার	২৫০০/- "
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৫০০/- "
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০০/- "
ভিতরের এক-চতুর্থ পৃষ্ঠা	৩৫০/- "

চেক, ড্রাফট ও মানি অর্ডার পাঠানোর ঠিকানা:

সম্পাদক, মাসিক জাগো মুজাহিদ
বি/৪৩৯, তালতলা,
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।
ফোনঃ ৪১৮০৩৯

সাধারণ শিক্ষিতদের পাঁচ বছর মেয়াদী কোর্সে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিক্ষার
এক ব্যতিক্রম ধর্মী প্রতিষ্ঠান

মাদ্রাসা দারুর রাশাদ

- * বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের এর অধীনে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় উজ্জ্বল সাফল্য
- * আদর্শ আবাসিক হিফজখানা
- * বাংলাদেশ নাদিয়তুল কুরআন-এর কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত আদর্শ মকতব

ভর্তি প্রতি বছর ১০ই শাওয়াল থেকে

জামাআত বিভাগে ভর্তির শর্ত কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে এস, এস, সি, উত্তীর্ণ।

যোগাযোগ

মাদ্রাসা দারুর রাশাদ

সেকশন-১২, ব্লক-ই, মীরপুর, ঢাকা

ফোনঃ ৮০৩১৬৩

জিহাদঃ মুসলিম জীবনের গৌরবময় অধ্যায়

প্রিন্সিপাল এ, এফ, সাইয়েদ আহমদ খালেদ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদের গুরুত্ব অপরিণীত। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ, এক কথায় মুসলমান নামে অভিহিত। জেহাদকে অব্যাহতি করে কোন মুসলমান চলতে পারে না; তার বেঁচে থাকা নিরর্থক। প্রশ্ন হতে পারে, ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে শত্রুর বিরুদ্ধে—সম্মুখ সমরে যোগাদান করার সুযোগ নেই, সামর্থ্য নেই; কাজেই আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করব কেমন করে? এরূপ চিন্তা বা ধারণা একজন মুসলিমের অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে বললে অতুক্তি হবে না। আর এ সন্দেহের যুগকাণ্ডে তাকে (মুসলমানকে) সারা জীবন দন্ধ হতে হয়। তার জীবন ব্যর্থতার পর্যাবসিত হয়।

পনেরশ বৎসর আগের ইসলামী চেতনায় উদ্ভাসিত মুসলিমের জীবন ও আজকের এই বিংশ শতাব্দীর মুসলিমের জীবন কত পার্থক্য তা ভাবতে গেলে চিন্তা-ভ্রমে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। জিহাদ ছিল সেদিনকার মুসলমানদের ‘নৃত্যপাগলছন্দ’—‘মৃত্যুঞ্জয়ী সূধা’, ‘জান্নাত প্রাপ্তির নিশ্চিত সনদ’। আর আজকের অধিকাংশ মুসলমানের নিকট জিহাদ হলো অবহেলিত বা ভীতপ্রদ এক বিষয় বিশেষ। পলায়ন ও পশ্চাদমান ধনী ও বৃহৎ রাষ্ট্রের করুণাকামী জীবন ব্যবস্থায় পরিচালিত জীবনই যেন আজকের মুসলমানদের অধিক কাম্য। এ কারণেই বিশ্ব মুসলিমের আজ এই দুর্গতি।

ব্যক্তিগত ও সংসার জীবন হতে রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মুসলমানকে যথাসম্ভব জিহাদী-জিদ্দেয়ী পালন করে চলতে হয়। এর কোন বিকল্প চিন্তা বা পথ নেই। যদি থাকে সেটা হবে ভুল, ভীষণ পথ—ক্ষতসের পথ। এতটুকু ধারণা থাকতে হবে একজন মুসলিমের যে, জিহাদের রূপ কি? সমর

ক্ষেত্রে যোগাদান করাই জিহাদের রূপ? হ্যা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহে আত্মা ও আত্মার নবী (সাঃ) কর্তৃক দেওয়া বিধান ও তাঁর সমর্থিত নির্দেশ মোতাবেক কপটতা বিমুখ জীবন অতিবাহিত করতে হবে এবং এটাই অতি সর্ধক্ষিতভাবে মুসলিম চরিত্রের প্রথম জিহাদ।

অন্যধর্মের মানুষের চাকচিক্যময় ক্ষতিকর জীবন ব্যবস্থা ও বিধান, খোদাদ্রোহী মতবাদ এবং শয়তানী পথের অবশ্যই পরিত্যাজ্য। নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় যেখানে ও যে কর্মে তা থেকে দূরে থাকাই জিহাদ। আত ও দুঃখীর দুঃখ মোচনে, অসহায়ের সাহায্যে, অন্যায়ের প্রতিবাদে, সত্যের পক্ষে সমর্থন দান ও দীন প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর ভূমিকা গ্রহণ করাও জিহাদের অংশ বিশেষ। অন্যায় ভাবে অর্জিত সম্পদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধনীর বিরুদ্ধে, অন্যায়কারী শক্তিম্যান ব্যক্তির সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া, অত্যাচার প্রতিহত করা, প্রতিবাদ করা এবং ন্যায়ের সমর্থনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা ইত্যাদির নাম জিহাদ, এসবই জিহাদের সমতুল্য কাজ।

হযরত ইসা (আঃ) বলেছেন: ‘সীজারের মাল সীজারকে ফিরিয়ে দাও’। পক্ষান্তরে নিখিল বিশ্বের চিরসুন্দর ও চিরশ্রেষ্ঠ মহান মানুষ, রহমতে আলম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসা (আঃ)—এর উত্তির সাথে এক হতে পারেননি বিধায় বলেছেন ‘কোন সীজারের অস্তিত্ব থাকাই উচিত নয়’। আত্মা পাক মানুষকে গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করার ও বুদ্ধি বা হিকমত খাটানোর কথা তাঁর পাক কালমে মধ্যে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ক্ষুদ্র জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে আমি আমার সামান্য জ্ঞানের আলোকে বলতে

পারি, নামাজাদা সম্রাট হলেও সীজার ছিলেন অত্যাচারী; তাঁর বিপুল সম্পদ আহরণ ছিল অত্যাচার-শোষণের মাধ্যমে। তাই পেয়ারা নবী মুহাম্মদ মুত্তফা (সাঃ) এই জালিম সম্রাটদেরকে কোনরূপ প্রশ্রয় দেননি, শোষণকারীকে যে কোন ভাবে অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করার কথা তিনি বলেছেন। বর্তমান দুনিয়া ও সমাজের এরূপ বহুচিত্র চোখে পড়ে, ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় এরূপ অনেক কিছু। দুনিয়া বা সমাজের এই শোষণপ্রিয় শ্রেণীর প্রশংসায় পক্ষমুখ এক ধরনের লোক—তাদেরকে বাস্তব জালাম ঠুকায়। এই অত্যাচারী শক্তিম্যানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে, বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলেও ঘৃণা সূচক মনোভাব ব্যক্ত করাও জিহাদের সামীল। হজরত আলী (রাঃ) বলেছেন, ‘সত্যের আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করার মানসে তুমি একা চল, তোমার সমর্থনকারী কেউ না থাকুক—তুমি পুরস্কৃত হবে অচিরেই মহা প্রবল ও মহা শক্তিম্যান আত্মার কাছ থেকে। পক্ষান্তরে অন্যায়কারী ও তাদের পক্ষাবলম্বনকারীরা অচিরেই ধ্বংস হবে।’ সত্য পথের পথিককে নিয়ে যারা উপহাস করে তারা নির্বোধ ও উদাসীন। উদাসীনরা বাস্তব জগতের স্বাদ-গন্ধের ভিতর থেকেও মৃতবৎ। প্রতি পদে পদে তারা লাজিত। জিহাদকে বহুমুখী বিচার বিশ্লেষণে সময় ও ধৈর্যের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রবন্ধের কলেবর অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাবে যা জিহাদী চেতনা বিমুখ পাঠকদের নিকট (আধুনিকতার স্পর্শে কাতর পাঠক) ‘মরার উপর খাড়ার ঘা’ স্বরূপ ঠেকবে। এতদসত্ত্বেও আমাকে আরো একটু অগ্রসর হতে হচ্ছে।

অনেকে বলেন, ধর্ম ও জাতি রক্ষার্থে সরাসরি যুদ্ধ বা জিহাদে যোগদান না করে কি জিহাদী জীবন পাশন করা যায় না? এটা হলো ব্যক্তি কেন্দ্রীক চিন্তা ও গতিবেষ্টিত ধারণা। উপরে এ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। একথা সত্য যে, নিজের নফস বা রিপু দমন করাও বড় জিহাদ। কিছু দেশ, জাতি ও ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া, ময়দানে নেনে পড়া, দাঁত ডাক্তা জবাব দানের মাধ্যমে এ তিনকে রক্ষা করা ও রক্ষার স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করা সর্বোত্তম জিহাদ বিরাট বাহাদুরীর কাজ। ইসলামের অনুসারী বিশ্বের সবশ মুসলমান একজাতি—এক উম্মাহ। বিশ্বের এ প্রান্তের মুসলমান অবশ্যই অপর প্রান্তের, অন্যদেশের মুসলমানের প্রতি দরদী হবে। “কুশ মুসলিমুন এখওয়াতুন” সকল মুসলমান ভাই ভাই। সুতরাং ভাই এর কাদনে ভাই ছুটে যাবে তবেই তো মুসলমান? এই অর্থের ব্যতিক্রম হলে কি করে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করি? এই সময় শুধু নামাজ, রোজা, মোরাকাবায় কি নিজেকে যথার্থ মুসলমান বলে দাবী করা যায়? শুধু এর মাধ্যমে মুসলিম নামের সার্থকতা ফুটে উঠে? জিহাদী জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়? বদর, ওহদ, খন্দক এবং পরবর্তী ইসলামী যুদ্ধগুলি কি আমাদের এ শিক্ষা দেয় না যে, তরবারীই আমাদের সত্যিকার মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন? কুরআনই বলে দেবে কখন, কোথায় এবং কোন অবস্থায় তরবারী বা অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। অশান্তির মোকাবেলায় ও শান্তির প্রতিষ্ঠায় এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নাই। আজকের মুসলমান অধিক সংখ্যায় নামকা ওয়াস্তে কুরআনের অনুসারী নয় কি? তারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে তরবারীকে। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। সত্যিকার মুসলিমের চরিত্র তো এ হতে পারে না। বিশ্বের বিবেকবান মুসলিম পণ্ডিত ও মনীষীদের নিকট আমার বিনয়ী জিজ্ঞাসা:

পারে কি মুসলমান এ দুয়ের সময় না ঘটিয়ে বেঁচে থাকতে? আমি বলব, যারা কথার ফুল খুরি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান, হয় তারা মুনাফিক না হয় তারা কাপুরুষ। আমাদের এই ভীকৃতার সুযোগ নিয়েই বিশ্বের মুসলিম বিশ্বাসী শত্রুর কামান চার দিক থেকে গর্জে উঠেছে। ওহদ রণাঙ্গণে কাকের কোরেশদের অফালনের বিরুদ্ধে উচিৎ জবাব দানের জন্য মুসলমান-গণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। রাসূলে কারীম (সাঃ) মুসলমানদের মনে দুর্জয় সাহসের সঞ্চার করেছিলেন একখানি তরবারীর গাত্রে পবিত্র দুটি লাইন খচিত করে:

“পলায়ন সে যে ঘৃণ্য ভীকৃতা অগ্রসরেই মান,

পালাবে কোথায়? তক্দির হতে নাহিক পরিত্রাণ।”

ফলে নিম্নেই সবার হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হয়। তলোয়ার ধারণের সৌভাগ্য অর্জন করেন সাহাবা আবু দোজানা (রাঃ)। এই তরবারী দ্বারা সেদিন ইসলাম ও মুসলমান রক্ষার জিহাদী যুদ্ধে আবু দোজানার অস্বাভাবিক শত্রুসংহারী অমিত বিক্রম দেখে নবীজি কিছুটা বিহবল হয়ে পড়েন। যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, সার্বিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় একটি জাতি। অস্ত্র ছাড়া আপোষে কি সেদিন কাজ হতো? মেনে নিত কি কোন ন্যায় কথা সেদিনের ‘যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের কাকির মুশরিকরা? আজও সেই বহুত্ববাদীদের উত্তরসূরীরা জগতে বিরাজমান। পারছে কি তারা এক আল্লাহর বিশ্বাসীদের সহ্য করতে?

আজকের দুনিয়ায় ইহদী নাসারা ও তাদের তাবেরার কর্তৃক মুসলিম ধর্মসম্প্রদায়ের যে বিভৎস তাওব নৃত্য চলছে, অপেক্ষাকৃত সবল মুসলিম দেশ ও জাতির তা প্রতিহত করার কি কিছু নেই? রাসূলে খোদার উদ্ভবের সে বলবীর্য কি ফুরিয়ে গেছে? জিহাদী জোশ কি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে? দুনিয়ার

১৩০ কোটি মুসলমান কি সংঘবদ্ধ হতে পারে না জাতীয় শত্রুর মরণ ছোবলের দাঁত ডাক্তা জবাব দিয়ে তাদের চির স্তব্ধ করে দিতে? চির গর্বিত জাতির মাঝে আর কি জন্ম নেবেনা খালেদ, তারিক, মুসা, গাজী সালাহ উদ্দীনের মত কোন মুক্তিকামী বীর? নিশ্চয় জন্ম নিবে, জন্মেছে অনেক। আত্মবলে বলিয়ান জাতি শুধু ধার করা ইতিহাস লেখেনি; ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। জয়ের মালা হিনিয়ে আনা ও দুর্বলের প্রতি করুণা প্রদর্শন—এতো মুসলিম জাতির ইতিহাস ও শিক্ষা। এই সেদিনের রাশিয়া, যার আদর্শ (?) দুনিয়ার একশ্রেণী লোকের পূজার ফুল ছিল, একতাবদ্ধ আফগান মুজাহিদদের কাছে তার কি পরিণতি হলো? ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের গতি কি ধারণা দিয়েছিল? বিজয় বয়ে আনে শুধুমাত্র মানব তৈরী অস্ত্রেই নয় ইমানী তেজ সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আর এ তেজবিক্রমই আজকের আফগানিস্তান ও সেদিনের পাকিস্তানকে রক্ষা করেছিল। অতীত স্মৃতি মুছে ফেলার বা ঢেকে রাখার নয়। অবশ্যই রোমহুনের বিষয়। অতীতের গৌরবময় গীথা স্মরণে এনে আমাদের ঝিমিয়ে পড়া খুনকে জেহাদী জয়বায় উজ্জীবিত করতে হবে এবং মুসলিমের স্বরূপ তুলে ধরতে হবে, চিত্রিত করতে হবে নিপুন শিল্পীর হাতে।

আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, ইসরাইল এমন সব বিজাতীয় রাষ্ট্র আমাদের দোস্ত নয়। এরা মুসলিম তথা মানবতার শত্রু। তারা অন্যায়কারী, অন্যায়ের সমর্থনকারী (অন্ততঃ পক্ষে মুসলিম স্বার্থে)। আজকের মুসলিম বিশ্ব কোন খেলালে তাদের দিকে চেয়ে আছে? তাদের তৎপরতা হলো এক মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। অপর মুসলিম রাষ্ট্রকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া, এভাবেই মুসলিম জাতির ধ্বংস সাধন করা এবং পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করা। আর কতকাল মুসলমান চুপ করে সইবে—দেখবে এ রক্ত—

খেলা? নীরবতার পুরস্কার আজ বার্মা, কাশ্মীর, বোসনিয়া, ফিলিস্তিন তথা বিশ্বের অন্য ধর্মাবলম্বী কারীদের দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের করুণ ও ভয়াবহ অবস্থা।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাধানের চেষ্টা চললেও প্রতিটি মুসলিমকে সকল রকম ভেদাভেদ ভুলে আজ এসব নির্ধাতীত নিরীহ মুসলমানদের হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সঠিক ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জিহাদই জিল্পেগীর গৌরবময় সময়। বিপর্যয় করলে জাতির অবলুপ্তি ছাড়া কিছুই আশা করা যায় না এখন ঘরে বসে তস্বী তেলাওয়াতের বিশেষ অবকাশ নেই। তেলাওয়াতের মহড়া এখন মুসলিম ভাই-বোনের জীবন, সম্রম-দেশ রক্ষার্থে রণাঙ্গণে চালাতে হবে। মর্মে মুমিনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে বিশ্বের মুসলিমকে। এখন বিবেকের দংশনে দংশিত হতে হবে। এটা সুপরিচরিত ক্রুসেড। প্রত্যেক মুসলমানকে অবিলম্বে গাজী সালাহ উদ্দীনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। নইলে সমূহ বিপদ। প্রাচ্যের মুসলিম আজ বিপন্ন; রক্ত সাগরে ভাসমান। পাকিস্তান বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমান কি রেহাই পাবে? নজীর পার্শেই দৃশ্যমান।

প্রত্যেক মুসলমানের জীবন পর্যায়ক্রমে এক একটি অধ্যায় এবং এর একটি অন্যতম প্রধান অধ্যায় হলো জিহাদ। কোন ভিন্নজাতির সাহায্যের অপেক্ষায় আর বসে থাকলে চলবে না। এদেশের বহু তরুণ আফগান ভাইদের ডাকে সাঁড়া দিয়ে রণাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছিল। সে সব মুজাহিদের জীবন ধন্য, চির অম্লান তাদের অবদান। আজ আফগানিস্তান মুক্ত। এ মুক্তির পিছনে ছিল কোন শক্তি? ছিল প্রায় মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ছিল আল্লাহর নির্দেশ জিহাদ। জিহাদী আন্দোলন পরিহার করে কেবল বিচারের ময়দানে জড়ো হলে তা' যেমন হতো প্রহসন, তেমনি হতো আফগান মুসলিমের অস্তিত্ব চির

বিস্তোপ। যদিও শাস্ত্র উত্তম তথ্যপি অস্ত্রের প্রয়োজনটাকে ক্ষেত্র বিশেষে অবশ্যই সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। মুসলিম বীর মুজাহিদদের গৌরবময় বীরত্বের কাছে রাশিয়ার মোড়লীপনা সম্পূর্ণ নিস্তদ্ধ, একটি অশুভ শক্তির বিরাট পরাজয়।

আজকের বোসনিয়া, বার্মা, কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনী মুসলমানদের অপরাধ কি? অপরাধ একটিই সেটা হলো, তারা মুসলমান। কই মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের উপর তো কোন অত্যাচার, অবিচার নেই। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপরতো আক্রমণ নেই। হ্যা, এরাও করতে জানে, এরা দুর্বল নয়; কিন্তু করে না। কারণ আপ-কুরআন তথা ইসলাম আমাদের এ শিক্ষা দেয়নি। ইসলামের প্রাণ শক্তি মহানবী (সাঃ) দুর্বল ও অশ্রিতের প্রতি অত্যাচার করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অন্যপক্ষে জালিম কর্তৃক নিরবে মার খাওয়ার কথাও রাসূলে করীম (সাঃ) সমর্থন করেন নাই। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, জালিমের জুলুমের সঠিক উত্তর দানের জন্য অগ্রসর হতে বলেছেন। এই পদক্ষেপ গ্রহণকেই জিহাদ হিসেবেই অভিহিত করা হয় এবং স্থান-কাল পাত্র ভেদে জেহাদ ফরজে আইনের মর্যাদায় উন্নীত হয়।

ওগো বিশ্ব মুসলিম! একবার ভেবে দেখ, সার্বিক হানাদার বাহিনী কর্তৃক কি অত্যাচার চলছে বোসনিয়া ও হার্জেগোভিনিয়ার নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর। সভ্য বলে (?) যারা চিংকার দেয়, পরিচয় দান করে তারা আজ কোথায়? যদি কোন খ্রীষ্টান বা অন্য জাতি আজ সামান্যতম অত্যাচারের শিকার হতো, দুনিয়ার এ প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিরাটতম দরদী আওয়াজ শোনা যেত, লয় হয়ে যেত সব কিছু। কিন্তু এ যে মুসলিম নিধন প্রক্রিয়া। হবেই তো "কত রবি জ্বলরে" নীতির প্রতিফলন। ওগো মুসলিম, ভেবে দেখ বার্মা, কাশ্মীরে মুসলিম নর-নারীর কি দুরবস্থা-কি দুরবস্তা ভারত কর্তৃক পূর্ণ

ব্যাকের মাধ্যমে বিভাঙিত মুসলমানদের। ঘরের এবাদত সংক্ষেপ কর; যার সামর্থ আছে, তাই নিয়ে রওয়ানা হও ভাই ও বোনের জীবন ও স্বাধীকার রক্ষার্থে। জিহাদের ডাক এসেছে। এ জিল্পেগী গৌরবোজ্জ্বল করে তোলা জিহাদী রঙ্গে। মনে রেখ, মুসলিমের আত্মদানে সাড়া না দিয়ে শুধু বসে উপাসনা নিরর্থক যা কেবলে দয়াহীন প্রার্থনা।

সারা বিশ্বের তাগুত্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ইসলাম ও বিপন্ন মুসলমানদের বিবেকহীন নরপশুদের হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব সকল মুসলিমের। মনে রাখতে হবে "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অতিবাহিত একটি সকাল বা সন্ধ্যা সারা দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।" অন্যপক্ষে, "বেহেশতের দরজাগুলি তপোয়ারের ছায়াতলো।" কুরআন ও তরবারী অঙ্গাঙ্গী ভাগে জড়িত। সুতরাং সামগ্রিক বিবেচনায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জিহাদ মুসলিম জীবনের গৌরবময় অধ্যায়; তুচ্ছ বিষয় নয়। আর এর বাস্তবায়ন দ্বারা যৌবন দীপ্ত জীবনকে সার্থক করে তোলার সময় দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। ওগো মুসলিম! কানপেতে শুন ভারত, কাশ্মীর, বোসনিয়া, বার্মার রক্ত সাগরে ভাসমান উৎপীড়িত মুসলিম ভাই-বোনের হৃদয় বিদারক আহাজারি। অমর কবির অগ্নিকরা বাণী শ্রবণ করে বলতে চাই, "অগ্র পথিক জিহাদী দল জোর কদমে এগিয়ে চলা।"

জাগো মুজাহিদ
পড়ুন
নিয়মিত
বিজ্ঞাপন
দিন।

মাহে শাবান ও শবে বরাতের ফজিলত

আমীনুল ইসলাম ইসমতী

শাবান এর নামকরণ: শাবান আরবী শব্দ, অভিধানিক ভাবে ছড়িয়ে পড়া, কিছুতিলাত, শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হওয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ মাসে বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহর রহমত ও দয়া বিস্তৃত হয় এবং মুসলমানদের প্রতি বিশ্ব প্রতিপালকের কৃপা ব্যাপক হয়ে থাকে। তাই এই মাসকে “শাবান” নামকরণ করা হয়েছে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, “শাবানকে শাবান নাম করণ এইজন্য করা হয়েছে যে, এমাসে যারা রোযা রাখবে তাদের অনেক কল্যাণ ও বরকত হবে। যদ্বারা সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে।” (ফয়যুল কাদীর)

শাবানের ফযীলত: হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, “রমযান আল্লাহর মাস (অর্থাৎ রমযান মাসের রোযা আল্লাহ তা’আলা ফরয করেছেন), আর শাবান হলো আমার মাস (অর্থাৎ এ মাসে তিনি রোযা ইত্যাদি নফল ইবাদত হিসেবে পালন করেছেন), তাই শাবান (এর ইবাদত গোনাহ থেকে) পরিত্রাণ কারী আর রমযান হলো গোনাহ মোচন কারী। (ফয়যুল কাদীর)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, “মহানবী (সাঃ) শাবানের মত অন্য কোন মাসে এত অধিক রোযা রাখতেন না, কেননা নবী (সাঃ) প্রায় পুরো শাবান মাস রোযা রাখতেন।” (বুখারী)

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শাবান মাসে যত পরিমাণ রোযা রাখেন অন্য কোন মাসে তো

আপনাকে এত পরিমাণ রোযা রাখতে দেখিনা? নবী (সাঃ) প্রত্যুত্তরে বলেন, “এ রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী মাস, অনেক মানুষ এমাসে (পুণ্যকাজে) অবহেলা করে, অথচ বান্দার আমল সমূহ এ মাসে রাবুল আলামীনের সমীপে পেশ করা হয়।” (নাসায়ী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বণেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন: “শাবান আমার মাস, রজব আল্লাহর মাস এবং রমযান আমার উম্মতের মাস। শাবান গোনাহ দূর করে আর রমযান (গুনাহ থেকে) পবিত্র করে।” (বায়হাকী)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, নবীকরীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, “রজব মাসের মহত্ব অন্যান্য মাসের উপর এমন যেমন কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবের উপর। আর শাবান মাসের ফযীলত বাকী সমস্ত মাসের উপর এমন যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব অন্য সকল নবীর উপর। এবং রমযানের ফযীলত বাকী সমস্ত মাসের উপর এমন যেমন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সমুদয় সৃষ্টির উপর।” (গনিয়াতুত তাগিবীন)

পূর্ণ শাবান মাস পুণ্য ও সওয়াব অর্জনের সুবর্ণ মাস। সূত্রাং সারাটি মাস আন্তরিকতার সাথে ইবাদত বন্দীগীতে মশগুল থাকা উচিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অনেককে শাবান এর প্রথম পনের দিনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ইবাদত বন্দীগী করতে দেখা গেলেও শেষ ভাগে তাদের মধ্যে চরম শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। তারা মনে করে, শাবানের প্রথম পক্ষই ফযীলতময় ও বরকত . পূর্ণ অথচ পূর্বোক্তোক্ত হাদীস সমূহ প্রমাণ করে যে, সারাটি মাসই বরকতময়।

ক্রমাগত ফযীলতের মাস রমযানের প্রকৃতি হিসেবেই যে শাবান মাসের এই গুরুত্ব ও ফযীলতময় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

লাইলাতুল বরাত এর ফযীলত: প্রতি বছর এক বার করে ঘুরে আসে এই পুণ্যময় রাত। চন্দ্র বর্ষ-পঞ্জিকার হিসেবে অষ্টম মাসের চৌদ্দই তারিখ দিবাগত রাতটির নাম হলো ‘ভাগ্যরজনী’। হাদীসের ভাষায় এর নাম, ‘লাইলাতুল বারাত’ ও ‘লাইলাতুল নিহফিমমিন শাবান।’ অর্থাৎ ‘ভাগ্য রজনী বা শাবান মাসের মধ্যরাত। ফারসী ভাষায় বলে ‘শবে বারাত’। পরম করুণাময় আল্লাহ এ বরকতময় পবিত্র রজনীতে অসংখ্য পাণী বান্দাকে ক্ষমা করে দিয়ে জাহান্নামের বিদগ্ধ, উত্তপ্ত, ধ্বংসাত্মক অগ্নিকুণ্ড ও মর্মভুদ শাস্তি থেকে মুক্তি দান করেন ভাগ্য লিপি করেন বলেই একে “লাইলাতুল বারাত” নামকরণ করা হয়েছে। শাবান ও লাইলাতুল বারাত শব্দদ্বয়ের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুমান করা যায়। এর ফযীলত সম্পর্কে হাদীসের কিতাবে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এসম্পর্কে মাত্র কয়েকটি হাদীস তুলে ধরলাম। আশা করি এরদ্বারা এই রাত্রের ফযীলত সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি আরো সজাগ হবে।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, “শাবানের মধ্যবর্তী রাত্রি যখন উপস্থিত হয় তখন সে রাত্রে তোমরা জাগরণ কর এবং পরের দিন রোযা রাখ। কেননা এ রাত্রে সূর্যোত্তের পর মহান আল্লাহ তা’আলা সর্বনিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং তিনি আহবান

জানিয়ে বলতে থাকেনঃ কোন ক্ষমা প্রার্থী আছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আছে কেউ রিযিক প্রার্থী? আমি তাঁর রিযিক দেব। আছে কোন বিপদগ্রস্ত লোক? তাকে আমি বিপদ মুক্ত করে দেব। এমনভাবে ফজর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে আহ্বান করতে থাকেন। (ইবনে মাজাহ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ একদা (রাত্রে) রাসূল (সাঃ) আমার ঘরে আগমন করে জামা কাপড় খুলতে খুলতে পুণরায় পরিধান করেন এবং ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। আমি এই ভেবে চিন্তিত হলাম যে, তিনি হয়ত অন্য কোন বিবির ঘরে প্রবেশ করেছেন। আমিও পিছনে পিছনে তাঁর খোঁজে বের হলাম। অনেক খুঁজে তাঁকে জালাতুল বাকীতে দেখতে পাই। তিনি সেখানে মৃত মুসলমান নর-নারী ও শহীদানের মার্গফেরাত কামনায় মগ্ন। আমি মনে মনে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হউক। আপনি প্রতিপালকের ধ্যানে মগ্ন, ইবাদতে ব্যাপ্ত আর আমি দুনিয়ার মোহে মগ্ন। অতপর আমি দ্রুত স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্তন করি এবং এ কারণে আমি ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকি। এর মধ্যে তিনি চলে আসেন এবং আমার অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করেন। হে আয়েশা, তোমার ঘন ঘন নিঃশ্বাসের হেতু কি? প্রত্যুত্তরে আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য ক্রবান হউক। আপনি আমার ঘরে তশরীফ এনে জামা কাপড় খুলতে খুলতে আবার পরিধান করতঃ বের হয়ে গেলেন যে কারণে আমি এই ভেবে অত্যন্ত চিন্তিত হই যে, হয়ত আপনি অন্য কোন বিবির কক্ষে গমন করেছেন। বহু খুঁজেও আপনাকে না পেয়ে অতপর আপনাকে দেখতে পাই যে, আপনি জালাতুল বাকীতে প্রার্থনায় মগ্ন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) তাঁকে বললেন, আয়েশা! তোমার কি আশংকা হয় যে, আল্লাহর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার

করবেন? তা কখনও হতে পারে না। আসল ব্যাপার হলো, হযরত জিবরাইল (আঃ) আমার নিকটে এসে জানানেন যে, আজ শাবানের (১৪ই দিবাগত) ১৫ই রাত্রি। এই রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা কসব গোত্রের মেশ পালের অগণিত পশমের চেয়েও অধিক পাণী বান্দাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু মুশরিক, হিংসুক, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী, পায়ের গিটের নিচে ইজার (লুঙ্গি, প্যান্ট, পাজামা ইত্যাদি) ঝুপিয়ে পরিধানকারী, মাতা পিতার অবাধ্য সন্তান এবং মদ্য পানকারীদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ অতঃপর নবীজী আমায় সন্বেদন করে বললেন, আজ সমগ্র রজনী আমি আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিব। তোমার অনুমতি আছে তো? হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেন, আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। হে আল্লাহর রাসূল, নিশ্চয়ই (আমার সম্মতি আছে)। অতঃপর রাসূল (সাঃ) নামায পড়তে শুরু করেন। তিনি সেজদায় যেয়ে এতদীর্ঘ সময় অবস্থান করেন যে, আমার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিলো যে, তিনি ইনতেকাল করেছেন কিনা! পরীক্ষা কবে দেখার জন্য আমি তার পায়ের তলায় হাত রাখি। অমনি তাঁর পা নড়ে উঠল। (আমার আশংকা ভুল ভেবে) আমি আনন্দিত হলাম। (বায়হাকী)

হযরত মুয়াব বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, "শাবানের মধ্যরাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির প্রতি তাজগিল দান করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যক্তিত্ব সবাইকে মাফ করে দেন। (তাবরানী)

যারা দাইলাতুল বারআতে ক্ষমা পায় নাঃ উপরোল্লিখিত হাদীসসহ অন্যান্য আরও হাদীস প্রমাণ করে যে, এ পুণ্যময় রজনীতেও কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ঃ (১) মুশরিক, (২) হিংসুক (৩) আত্মীয়তা সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী, (৪) পায়ের টাখনু গিড়ার নীচে কাপড় বা প্যান্ট, পায়জামা

পরিধানকারী, (৫) মাতা-পিতার অবাধ্য-তাকারী, (৬) মদ্যপায়ী, (৭) অন্যায়ভাবে হত্যাকারী, (৮) অন্যায়ভাবে চাঁদা বা খাজনা গ্রহণকারী (ঘুষখোর), (৯) যাদুকর, (১০) গনক, (১১) হস্তরেখা দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং (১২) গায়ক ও বাদক। এই মহিমাবিত রজনীতেও ঐ সকল লোক মাফ পাবে না। তবে তওবার দ্বারা কারও বন্ধ নয়। যদি এসব লোক খাঁটি তওবা কবে নেয়, আশা করা যায় করুণাময় তাদের ক্ষমা কবে দেবেন। আর বান্দার হক বান্দাকে বুঝিয়ে দিতে হবে অথবা তার নিকট থেকে ক্ষমা নিতে হবে।

প্রচলিত বিদআত ও বর্জনীয় কার্যাবলীঃ এটি পবিত্র ও মুক্তির রজনী হওয়া সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিকতার কারণে তাতে কিছু বিদআত ও অপসংস্কৃতির প্রবেশ ঘটেছে যা একান্ত বর্জনীয়। কারণ এসব রোসম ও কার্যাবলী আমাদের ইহকাল ও পর কালের শুধুই অমঙ্গল ও ক্ষতি ডেকে আনবে।

(১) আতশবাজী, পটকা, গোলাবারুদ, রংবাতী ইত্যাদি ফাটান বা পোড়ানোর জন্য বয়স্ক লোকেরা বালক বালিকাদের হাতে টাকা গুজে দেন। যা এই পবিত্র রজনীর গাভির্ষ ও গুরুত্ব মারাত্মকভাবে নষ্ট করে। অযথা অর্থ ব্যয় যার অনুমতি ইসলামে নেই। এ সহক্ষে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।" (বনি ইসরাইল : ২৭)

দ্বিতীয়তঃ আতশবাজীর কারণে কোন ভয়ংকর অঘটন ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। তৃতীয়তঃ বাজী ফুটানোর গগণবিদারী আগুয়াজ ইবাদত বন্দীগিতে বিশ্বস্তার সৃষ্টি হয়।

(২) আলোক সজ্জা এতেও অর্থের অপব্যয় হয়।

(৩) হাণ্ডিয়া রুটি পাকান, হাড্ডি বাসন বদলানো, ঘরলেপা এবং বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেড়ান এই রাতে একান্ত বর্জনীয়। কারণ প্রথম এতে কোন শূণ্যতো নেই উপরন্তু এতে সম্পদ ও সময়ের অপচয় হয়।

বাংলা বিশ্বক মুসলিম বিশ্বঃ ~~ইসলাম~~ বিজয় কোন পথে?

আব্দুল্লাহ-আল-ফারুক

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইসলাম পৃথিবীময় তার গৌরবোজ্জ্বল পদচারণা অব্যাহত রেখেছিল। পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সুমহান দায়িত্ব মুসলমানরা সফলতার সাথে পালন করেছিল এ সময়। ইন্দোনেশিয়া থেকে সুদূর জাঞ্জিবার পর্যন্ত সকল মানুষ আবদ্ধ ছিল ইসলামের সুদৃঢ় আত্মত্বের বন্ধনে। কিন্তু মুসলমানদের দায়িত্ব পালনে শীথিলতা এবং পাশ্চাত্যের কৃষি যুগ থেকে শিল্প ও বিজ্ঞানের যুগে প্রত্যাবর্তনের সাথে প্রতিযোগিতায় মুসলিম বিশ্বের অনগ্রসরতা, সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর উত্থান এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত তুরস্কের উসমানীয় সাম্রাজ্য মুসলিম বিশ্বের শক্তির ও ঐক্যের প্রতীক বলে বিবেচিত হত। এ তুর্কীরাই ক্রুসেডের নামে উন্মাতাল পাশ্চাত্যের মিলিত বিশাল বিশাল বাহিনীকে বার বার নাস্তানাবুদ করে দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইসলামের সেবা করে আসছিল। হাভিনি, মানজিকার্ট, নিকোপলিশ, জালাকা, কনস্টানটিনোপোল; কসোভো প্রভৃতি যুদ্ধে পাশ্চাত্য তুর্কীদের নিকট সমুদ্র সমরে পরাজিত হয়ে অবশেষে তুর্কী সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করার নীল নকসা গ্রহণ করে। এই সময় তুর্কী সাম্রাজ্য পূর্বে আরব উপদ্বীপ, জর্ডান, সিরিয়া প্যালেস্টাইন, ইরাক, কুর্দিস্তান, এশিয়া মাইনর ও পূর্ব ইউরোপের একাংশ নিয়ে গঠিত ছিল। ধূর্তবাজ সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের কুটনীতির ফলে পূর্বেই তুর্কী সাম্রাজ্য থেকে হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও সার্বীয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ এলাকায় পাশ্চাত্য শক্তি সর্বদা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উস্কানী দিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা জ্বিঁয়ে রাখত এবং বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন একটু জোরদার হলেই ফ্রান্স,

বুটেন ও রাশিয়া মিলিতভাবে তুরস্কের ওপর কুটনৈতিক ও সামরিক চাপ প্রয়োগ করে তাদের পুরো পুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে মদদ যোগাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বুটেন কুটকৌশলে তুরস্ককে যুদ্ধ ক্ষেত্রে টেনে আনে। জার্মানী থেকে তুরস্কের ক্রয় করা দুই খানা জাহাজ বুটেন আটক ও আরও দুইখানা হস্তান্তরিত জাহাজ ডুবিয়ে দেয় এবং দার্দানেলিজ প্রণালীর মুখে উস্কানীমূলক রণপোত বসিয়ে রাখে। এ সকল উস্কানীর কারণে তুরস্ক বিশ্ব যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য হয়। গুরুত্বপূর্ণ দার্দানেলিজ প্রণালী দখলের জন্য ও লক্ষ ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন করা হয়। ফলে তুরস্কেরও বাহা বাহা ৫ লক্ষ সৈন্য এর প্রতিরক্ষায় মোতায়েন করতে হয়। এই সুযোগে ফ্রান্স, রাশিয়া ও বুটেনের মিলিত বাহিনী সম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে প্রবল চাপ প্রয়োগ করে। তা' সত্ত্বেও বাগদাদ রণাঙ্গনে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কী বাহিনীর হাতে ইংরেজদের চরম পরাজয় ঘটে। সমুখরণে পরাজিত হয়ে বুটেন এবার কুটনীতির খেলায় অবতীর্ণ হয়। বুটেন খাড়িবাজ লরেন্সকে আরব এলাকায় পাঠাল জাতীয়তাবাদ নামক বটিকা দিয়ে। লরেন্স আরবের মীর জাফর শরীফ হুসাইনকে হাত করল এবং আরব, প্যালেস্টাইন, ইরাক ও সিরিয়ায় জাতীয়তাবাদের ধূয়া তুলে তাদেরকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে। ইংরেজরা তুর্কী সেনাবাহিনীতে কর্মরত আরবদের বোঝাল যে, তারা যদি মিত্র বাহিনীর সাথে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে যুদ্ধ শেষে তাদের স্বাধীনতা দেয়া হবে। ব্যাস, তুর্কী বাহিনী যখন ফ্রান্স, বুটেন, রাশিয়ার মিলিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত ঠিক সেই সময় ৪ লক্ষ আরব সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্র সহ মিত্র বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। রণাঙ্গণের চেহারা মুহূর্তে পাণ্টে যায়। শরীফ হুসাইনের বিদ্রোহাত্মকতার জন্য হেজাজ ও

অন্যান্য আরব এলাকায়ও লক্ষাধিক তুর্কী সৈন্য বন্দী হয়। মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক তুরস্ক ভেঙ্গে সৃষ্টি হয় সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান, প্যালেস্টাইন, ইয়ামেন, কাতার, আরব আমিরাত, কুয়েত, সৌদি আরবসহ বহু আলাদা ভূখণ্ড। ভারত বর্ষের আজাদী আন্দোলনও এর প্রতিক্রিয়ায় চরম ব্যর্থ হয়। মধ্য প্রাচ্যের বিষ ফোঁড়া ইজরাইলেরও জন্ম হয় এই সময়। আর মিশর, তিউনিসিয়া, সুদান, আলজেরিয়া, মরোক্কো, ইরিত্রিয়া, ফ্রান্স ও বুটেনের দখলে চলে যায়। তুরস্কের আত্মাধীন বিশাল কুর্দিস্তান রাশিয়ার দখলে চলে যায়। পূর্ব ইরোপে অভ্যদয় ঘটে গ্রীক ও আলবেনিয়ার। তুরস্কের খেলাফত কাঠামো ভেঙ্গে যাওয়ায় ও মুসলিম বিশ্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে পরিণত হওয়ায় বিশেষ মুসলিম শক্তি মুমূর্ষু সিংহে পরিণত হয়। যার জের আজও অব্যাহত রয়েছে। মুসলিম শক্তির এই নাটকীয় পতনের পর বহুস্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিজেদের গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন পন্থায় আন্দোলন ঘটেছে। কিন্তু কোন কোন আন্দোলনের পরিধি প্রত্যন্ত সংকীর্ণ ও তারা ইসলামী দর্শন কাটছাট করে অনুকরণ করায় তা মুসলিম উম্মাহর নিকট সমান ভাবে অনুকরণীয় আদর্শরূপে গ্রহণযোগ্য হয় নি। তা' থেকে মুসলিম বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কোন উপকার হয়নি। ইসলাম বিদ্যেবী দাস্তিক শক্তির মোকাবেলায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বের খেলাফত কাঠামো বা তার নিকটবর্তী কোন ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ারও কোন সুযোগ এর দ্বারা সৃষ্টি হয়নি।

তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফতের পতনের পর পাশ্চাত্যের সমর্থনে বাকী তুরস্ক কামাল পাশা ক্ষমতাসীন হন। পাশ্চাত্যের ইঙ্গিত ও ইসলাম বিদ্যেবী ভাবধারায় আক্রান্ত কামাল পাশা তুরস্কের অবশিষ্ট মুসলমানদের বন্দী পালনের

ওপর কাঁচি চালান এবং তিনিই সর্ব প্রথম কোন মুসলিম দেশে পাশ্চাত্য থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদকে ধার করে আনেন; পর্দা প্রথা, আরবী পঠন ও পাঠনের ওপর নিবেদাজ্ঞা জারী করেন। সুদীর্ঘ সময় ধরে তুরস্কে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে সংস্কৃতি ও শিল্প-কলা গড়ে ওঠে সেগুলি বিদায় করে পাশ্চাত্যের ফ্যাশন দ্রুত নগ্ন পোষাক ও সংস্কৃতি চালু করাসহ শরিয়তের বহু আইন বাতিল করেন। মোটকথা, তার উদ্দেশ্য ছিল খেলাফত কাঠামো বাতিল করার সাথে সাথে দেশের সকল ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ কায়েম করা।

এককালের পাশ্চাত্যের কাছে ভীতিকর শক্তি তুরস্ক আজ মাত্র ন্যাটোর একজন সদস্য। এককালের তুরস্কের উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ বসনিয়ায় আজ চলছে মুসলিম নিধনযজ্ঞ। সেখানে তার পশ্চিমা খৃষ্টান দেশগুলির তাবেদার জাতিসংঘের নিকট সামরিক হস্তক্ষেপ করা বা আবেদন ছাড়া কিছুই করার নেই। সে আজ এতই অসহায়।

এককালের পৃথিবীময় আতঙ্কসৃষ্টিকারী তাতার মোঙ্গল বাহিনীর বর্বর দমন অভিযানের মুখে যখন একের পর এক মুসলিম এলাকার পতন ঘটছিল, মিশরের পতন ঘটলেই যখন বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব মুছে যেত, মুসলমানদের পবিত্রস্থান মক্কা মদীনাও বিধর্মীদের হস্তগত হচ্ছিল, প্রায় ঠিক তখনই মিশরীয়রা বীরের মত ঘুরে দাঁড়াল, কুতুজ ও বেবারস আল বানুকখারীর নেতৃত্বে তারা মোঙ্গল বাহিনীকে ৩০০০ মাইল পথ তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ইসলামের এই বীরপুরুষ বেবারস একই সময় পাশ্চাত্যের ৫ম ক্রুসেডার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে, বন্দী করে রাজা নবম পুইকে। এই মিশর থেকেই সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডারদের দীত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই মিশর থেকেই সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলশ্রুতিতে উত্তর আফ্রিকার দুর্ধর্ষবারবার

উপজাতির সম্ভ্রান্ত তারিক বিন জিয়াদ মরোক্কো থেকে অভিযান চালিয়ে সাগরের ওপারের দেশ স্পেন দখল করেন। এই মিশরকে কেন্দ্র করেই তখন গড়ে উঠেছিল শ্রেষ্ঠ ইসলামী শাসন ও সভ্যতা। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই মিশর ফ্রান্সের নেপোলিয়ানের বাহিনীর নিকট পরাজিত হলে শুরু হয় অধঃপতনের আধার ইতিহাস।

মিশরের ভৌগোলিক ভূখণ্ডের মধ্যে সীমিত আকারে উনবিংশ শতকের প্রথমে ও প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে যথাক্রমে মুহাম্মদ আলী পাশা ও জগলুল পাশার নেতৃত্বে দুটি জাতিয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। মুহাম্মদ আলী পাশা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের নিকট থেকে দেশকে স্বল্প সময়ের জন্য মুক্ত রাখতে পারলেও জগলুল পাশার আন্দোলন অতটুকু সাফল্যও অর্জন করতে পারেনি। ১৯৪৮ সালে মিশরের শায়েখ হাসান বানার নেতৃত্বে “ইখওয়ানুল মুসলিমীন” নামে একটি খাটি ইসলামী গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। কিন্তু সোভিয়েতের চক্রান্তে জামাল আবদুন নাসের নামক একজন সামরিক অফিসার ইসলামী দর্শন বিরোধী সংকীর্ণ “আরব জাতীয়তাবাদ” এবং সুয়েজ খাল ইস্যুকে পুঞ্জি করে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় বসে সে পিরামিড ও ফেরাউনী সংস্কৃতি প্রতর্ন করে এবং ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা নিবিদ্ধ ঘোষণা করে। ইখওয়ানের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্মমভাবে দমন অভিযান চালানো হয়, দেশকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অনুসারী বলে ঘোষণা করা হয়। মিশরে এখনো ধর্ম নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের হ্রাসবরণে ইসলাম পন্থীদের কারারুদ্ধ ও ফাসির রক্ততে বুকিয়ে নিঃশেষ করে দেয়ার তাওব আজও অব্যাহত রয়েছে।

মুসলমানদের প্রথম কেবলা ও পবিত্রস্থান বায়তুল মুকাদ্দাস আজও ইহুদীদের দখলে। জ্ঞানবাদী ইজরাইল জেরুজালেম দখল করে সর্বপ্রথম এই মসজিদটির অবমাননা করে, লাখো লাখো আরবকে দেশ থেকে জোর করে বিতাড়িত করে। জ্বরদস্তি ভাবে

আরব ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করে ইহুদী রাষ্ট্র ইজরাইল। পাশ্চাত্যের মদদে মধ্য প্রাচ্যের মুসলমানদের ওপর বার বার হামলা চালায় এবং বিজৃত ভূখণ্ড দখল করে নেয়। আজ গোটা ফিলিস্তিনী জাতি দেশ হারিয়ে প্রবাসী জীবন যাপন করছে। বিগত ২৯ বছর ধরে নিজেদের মাতৃভূমি উদ্ধার ও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র কায়েমের জন্য পি, এল, ও সশস্ত্র, রাজনৈতিক ও গণআন্দোলন উভয়ই করেছে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মজিল থেকে ক্রমশ দূরে সরে পড়ায় তারা যাদের হাতে লাখ লাখ আরব মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত সেই ঘাতক ইহুদীদের সাথে হাত মিলিয়ে নিরর্থক আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ফিলিস্তিন থেকে বহিঃকৃত সকল আরবই মুসলমান অথচ তাদের স্বার্থ আদায়ের আন্দোলনকারী সংগঠনটি ধর্মনিরপেক্ষ ও সোভিয়েত ঘেঁষা যা নিশ্চিত একটি দুঃসংবাদ।

বীরত্ব ও উদারতায় বিশ্বখ্যাত উপমহাদেশের মুসলমানরা বিশ্বের পরিবর্তনের সাথে ভাল মেলাতে গিয়ে ইসলামের তরবারী ও দর্শনকে যাদুগারে আবদ্ধ করে রেখেছে। তারা এতখানি পরধর্ম সহিষ্ণু, উদার এবং প্রচলিত মিছিল মিটিং প্রিয় হয়ে পড়েছে যে এখন তাদের মসজিদ ভাঙছে, স্পেনের স্টাইলে ভারত থেকে মুহাম্মদী উম্মাতদের নিশানা মুছে ফেলার তৎপরতা চলছে, তবুও তারা সিংহের মত গর্জে উঠছে না। মাত্র অল্প কয়েক বছর পূর্বেও অন্যায়ের প্রতিবাদে উপমহাদেশের রাজপথ যে সকল আলিমদের শহীদী রক্তে রাস্তা হত কোথায় সেই সাহসী আলিম সমাজ? সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সেনাদের চলার পথ যে মুজাহিদদের তপ্ত শোনিতে পিচ্ছিল হত, যে মুজাহিদদের তাকবির ধ্বনিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভীত পর্যন্ত কোঁপে উঠত তারা আজ কোথায়? পোষ্টার, প্রতিবাদ সভা, সিম্পোজিয়াম ও বিবৃতির ভীরে সে মুজাহিদদের কাফেলা আজ হারিয়ে গেছে। একদা যারা ভারতকে ৮০০ বছর শাসন করেছে আজ সে দেশের সামরিক বাহিনীতে একজন মুসলমানও

খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ্বকে দেখানোর জন্য ধামাধরা দু'একজন মুসলমান আমলাকে প্রশাসনে 'শো' করা হয়। সবই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। তবে ভাগ্যকে দোষী করে পরিত্রাণ নেই। যারা দুর্বল, যারা ঐতিহ্যহীন তারা ইরাকের মত ভাগ্যকে দোষী করে, পরিস্থিতির মুকাবিলায় নিরব হয়ে যায়।

উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশ আলজেরিয়া দীর্ঘ দিন উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। কিন্তু প্রতারণামূলক পদক্ষেপ নিয়ে ফ্রান্স ১৮৩০ সালে এ দেশটি দখল করে নেয়। ফরাসীদের এ অপকর্মের বিরুদ্ধে আমির আবদুল কাদির জিহাদ ঘোষণা করেন। ইতিহাসখ্যাত দুর্ধ্ব বারবাকদের জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ায় ফরাসীদের প্রভুত ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তারা ১৮৩৪ ও ১৮৩৭ সালে দু'দবার সন্ধি করে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের জাতি ফরাসীরা ১৮৪০ সালে পুনঃরায় শক্তি সঞ্চয় করে আলজেরিয়া দখল করে নেয়। তখন আমির আবদুল কাদির নির্বাসিত হলে তার অনুসারীরা জিহাদ অব্যাহত রাখে। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই ইসলামী আন্দোলনটি ক্রমশ জাতিয়তাবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়। উডমা (UDMA), এম, এল, টি, ডি, (MLTD) ও সর্বশেষ (FLN) নামে জাতিয়তাবাদী সংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। অবশেষে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ধরে আলজেরিয়া ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু FLN ছিল পরিপূর্ণ মার্ক্সবাদী কমুনিষ্ট দর্শনে বিশ্বাসী। FLN এর একনায়কতান্ত্রিক শাসন আমলে দেশ থেকে মিশর ও তুরস্কের ষ্টাইলে ইসলামকে বিতাড়ণের চেষ্টা করা হয়। মানুষকে নাস্তিক ও কমুনিষ্ট বানানো সহ ইমান ধ্বংসের যাবতীয় প্রচেষ্টা চালানো হয় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। এই গোষ্ঠীর শাসনামলেই আরাস মাদানীর নেতৃত্বে একটি পূর্ণ ইসলামী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং অল্পসময়ের ব্যবধানে নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী সালভেশন ফ্রন্টের ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হলে ইখওয়ানের ন্যায় এই সংগঠনটি একই পরিণতি বরণ করে।

মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে পাশ্চাত্যের খুঁটির জোড়ে কায়ম রয়েছে শেখতন্ত্র, আমলাতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও দাস্তিক একনায়কতন্ত্র। এর কোন দেশেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে ইসলাম কায়ম নেই। একনায়ক, আমির, শেখ, রাজা-বাদশারা শাসনের নামে শোষণ করতে বিভিন্ন দেশ থেকে যখন খেটুকু দরকার সেইটুকু মন্ত্র আমদানী করেন। ইসলামী শরিয়তকে উপেক্ষা বা বিরোধীতা করতে তারা খুব কমই বিধাব্রিত হন। এর পাশাপাশি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্যের প্রোপাগান্ডার ফলে লু-হাওয়ার মত বইছে "গণতন্ত্র" নামক একটা ভয়ংকর প্রবাহ। অনেক মুসলিম দেশ এই কুফরী গণতন্ত্র গ্রহণ করে কি প্রমাণ করেছে না যে, আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের চেয়ে আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ এরিস্টটল, উইলসনের গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ এবং তারা কি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ উপেক্ষা এরিস্টটল ও গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের বেশি জানী ও পণ্ডিত মনে করছে না? রাসূল (সাঃ) আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের সকল পথের নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। কুরআনের সর্বশেষ আয়াত যা বিদায় হজ্জের সময় নাজিল হয় তাতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।" নিজ হাতে গড়া রাসূলে (সাঃ) রাষ্ট্র, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বা আল-কুরআনের কোন বক্তব্যের সাথে বর্তমান প্রচলিত গণতন্ত্রের দূরতম কোন সম্পর্কও আছে কি? অথচ গণতন্ত্রের নামে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব মাতাল হওয়ার দশা। গণতন্ত্র, জাতিয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতা কেন্দ্রীক আন্দোলন প্রভৃতির কারণে মুসলিম বিশ্ব এ পর্যন্ত ৫৩টি খণ্ডে খণ্ডিত হয়েছে। ফলে সামগ্রিক ও আদর্শিক মুসলিম জাতিয়তাবাদ আজ ভুলুপ্ত। ইসলামী দর্শন অনুযায়ী কোন মুসলিম ভূখণ্ড কোন শত্রু রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে সকল মুসলিম এক হয়ে সে ভূখণ্ড উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্ররোরচনার ফলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি নিজ সীমান্তের বাইরের মজলুম মুসলমানদের জন্য নৈতিক সমর্থন ছাড়া আর কোন সাহায্য করতে পারছে না। এ জন্য

অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, ধর্ষণ, গণহত্যার শীকার হচ্ছে রোহিন্জা, কাশ্মীরী, মরো, ফিলিস্তিনী, কুর্দী, বসনিয়া ও কসোভোর আলবেনীয় বংশোদ্ভূত মুসলমানরা।

ইসলামের ইতিহাসে ইনবিংশ শতাব্দী থেকে এই স্বল্প সময়টুকু চরম অমানিশার সময়। পতন আর বিপর্যয় যেন এ সময় মুসলমানদের তাড়িয়ে ফিরছে। এই দুর্বোপ কাটিয়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু সাফল্য নামক বস্তুটির কেউ নাগাল পেল না। মিশর, আলজেরিয়ায় খাটি ইসলামী আন্দোলন হয়েছে, প্যালেস্টাইন, মিশরে ধর্ম নিরপেক্ষ আন্দোলন হয়েছে। আবার মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশসহ মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানেই জাতিয়তাবাদী শক্তি ক্ষমতায় এসেছে সমারিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে আর কত দৌহ মানব যে গত হলো এই সময়ের মধ্যে কিন্তু হারান সুদিন আর ফিরে আসল না।

১৯৪৫ সালের ২২শে মার্চ অধিকাংশ আরব দেশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল আরব লীগ। কিন্তু দীর্ঘ পথ যাত্রায় আরব খুঁড়ের ওপর থেকে বয়ে গেছে অসংখ্য বিধ্বংসী সাইমুম বড়। ইসরাইলের জন্ম, আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, ইহুদীদের আরব ভূখণ্ড জবরদখল ও ফিলিস্তিনীদের বহিঃষ্কার, ইহুদীদের জল-আকসা মসজিদে অগ্নি সংযোগ, লেবাননে গৃহযুদ্ধ ও ইসরাইলের সামরিক হস্তক্ষেপ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ইরাক-পাশ্চাত্যের যুদ্ধ ও বর্তমান সংকট, লিবিয়ায় মার্কিন হামলা ও বর্তমান জাতিসংঘের অবরোধ, আলজেরিয়ায় জনমতের কঠোরোধ সহ কোন সমস্যার সমাধানেই আরব লীগ কোন বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পারেনি। মোয়াদ অন্তর সভাপতি নির্বাচন, প্রস্তাব গ্রহণ, সমস্যা নিয়ে নিষ্ফল আলোচনা ও ক্ষেত্র বিশেষে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যেই আরব লীগের তৎপরতা সীমাবদ্ধ।

১৯৬৯ সালে খেলাফত কাঠামো পুনরুদ্ধারজীবীত করণ, ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বকে জোরদার এবং বিশ্ব মুসলিম স্বার্থকে বহিঃশক্তির কবল থেকে সুরক্ষার জন্য মুসলিম দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয় ও,

আই, সি। কিন্তু এ সংস্থাও আরও লীগের পথের অনুসারী হয়। আফগানিস্তান, দুর্ভিক্ষ পীড়িত সোমালিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, ইরিরিয়া, ভারত, বুলগেরিয়া, বসনিয়া, আরাকান, মিলানান্ড, চীন ও মধ্য এশিয়ার মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে, অধিকার হারা হয়ে দেশ ছেড়েছে কিন্তু ও, আই, সি এ সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারছে না। বসনিয়ায় জাতিগত উৎখাত অভিযানের মুখেও সামরিক হস্তক্ষেপে পাশ্চাত্যের তাবোদার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ জানিয়ে সে দায়িত্ব শেষ করেছে। এ সংস্থা এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি শীর্ষ সম্মেলন করেছে কিন্তু মুসলিম বিশ্বের কানাকড়িও লাভ হয়নি তাতে।

মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এছাড়াও বহু সংগঠন গঠিত হয়েছে। গোষ্ঠারিং, মিছিল, সিম্পোজিয়াম, মিটিংও কম হয়নি। কাশ্মীর, বসনিয়া, ফিলিস্তিনের ন্যায় সকল অশান্ত মুসলিম দেশের সমস্যার সমাধানের

জন্য এবং অপরাধীর বিচার চেয়ে জাতিসংঘেও আমরা অনেক ধর্গা দিয়েছি। নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ এসব সমস্যা নিয়ে কাগজে কলমে অনেক প্রস্তাবও পাশ করেছে কিন্তু এতে মুসলিম জাতির কোন কল্যাণ তো হয়নি আরও এই কালক্ষেপণের সুযোগে উত্তর উত্তর আমাদের অধঃপতন ঘটছে। বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, আল-আকসা মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, পবিত্র কাবা শরীফ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, দু'কোটির বেশী মুসলমান উদ্বাস্ত অবস্থায় আছে, ইমসলামের ওপর খৃষ্টবাদ প্রধান্য বিস্তারের পায়তারা করছে। এসব সমস্যার যেন কোন সমাধান নেই।

ইসলামের ইতিহাসে পূর্বে কখনো এত হরেক রকম আন্দোলন হওয়ার নজীর পাওয়া যায় না। বরং গতানুগতিক আন্দোলনের ভিড কম থাকার ফলে তখন মুসলিম বিশ্ব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি বলেই গণ্য

হতো।

মুসলিম বিশ্বের এই অবনতিশীল পরিস্থিতির দিকে নজর দিলে মনে প্রশ্ন জাগে, বিশ্বময় মুসলিম জাতীয়তাবাদের উত্থান ও মুসলিম জাতির বিজয় কোন পথে?

এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর স্পষ্ট বলে গেছেনঃ, "জিহাদ ইসলামের শিখর চূড়া।" তিনি আরও বলেছেনঃ "তোমরা যখন জিহাদ পরিত্যাগ করে গরুর লেজ ধরে কৃষি কাজ করাকে ভলবাসবে এবং লিপ্সা, কৃপণতা, আনাহা, সুদখোরী, ও স্বার্থকতা তোমাদের চরিত্রের অংশ হয়ে দাড়াবে তখন তোমরা পরাধীনতা ও পর পদদলনে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হতে থাকবে।"

রাসূল (সাঃ) আরও বলেছেনঃ "যে জাতি জিহাদ পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তাদের ওর ব্যাপক আযাব-গজব আপতিত করবেন।" অতএব জিহাদই আমাদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার, বিশ্বময় আল্লাহর রাই-শাসিত ইসলাম বিদ্রোহ দাওদকে পরাজিত করার একমাত্র বিকল্পহীন পথ।

আমার দেশের
(১৮ শ্রু: পদ)

মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী কাজ করছে। ইসলামের ওপর আঘাত আসলে মুসলমানরা তার প্রতিবাদ করে এবং তার বিরুদ্ধে মুসলমানরা তাদের ধর্ম-কর্ম সূত্রেভাবে পাশন করুক তাতে তাদের বড় অসুস্থি।

সরকার আজ পর্যন্ত মুরতাদদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি, যাদানিক নামক চক্রকে সেলিয়ে দিয়েছে টুপি, দাড়িওয়ালা লোকদের ওপর হামলা চালাতে। দেশের মাঝে মাঝে তাদের ওপর হত্যাকাণ্ডের চরিত্র বর্বর হামলা চালাচ্ছে সে ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া নেই এই

সরকারের বরং মুসলমানদের উল্টো মৌলবাদী বলে গালাগাল দেয়া হচ্ছে। দেশের মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় এই সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই। তবে কোন প্রয়োজনে এই সরকার তৎপর বলে আছেন। কাদের উপকার করছে এই সরকার?

(২৭ শ্রু: দেওয়া)

লিভার ও কিডনী রোগীরা লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশে প্রায় এক কোটি লোক লিভার ও কিডনী রোগে ভুগছে, যাদের বার (২) জন্ম হয়, মুখে দাগ পড়ে, চক্ষের পার্শ্বে কালো দাগ, অল্প বয়সে চোয়াল ভেঙ্গে যায় ও দিন দিন স্থিতিশক্তির হ্রাস পাচ্ছে এবং মলের সাথে Mucus যাচ্ছে। তাদের অবশ্যই লিভারের কোন না কোন সমস্যা আছে। এ ছাড়া প্রস্রাবের ধারণ-ক্ষমতা কমে যাওয়া, কোমরে ও নাড়ীর নিম্নে চিন (২) করে বেদনা করা, যৌন শক্তি দিন দিন কমে যাওয়া, প্রস্রাব পরীক্ষায় Albumin Trace; pus cells ও Epithelial Cells. বেড়ে গেলে কিডনীর সমস্যা থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই আপনার লিভারের HBs Ag Test ও Bilirubin পরীক্ষার দ্বারা সময় থাকতে নিম্নের ঠিকানায় সু-চিকিৎসাকরুন।

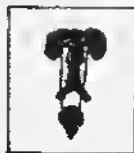
যোগাযোগ ও সময়ঃ

হ্যানিম্যান হোমিও ক্লিনিক

২৫, সামসুজ্জোহা মার্কেট (২য় তলা)

বাংলা মটর, ঢাকা

সময়ঃ সকাল ৯টা-১টা, বিকালঃ ৪টা-৮টা



ধন্যবাদান্তে

প্রফেসর ডাঃ এন. ইউ. আহমাদ
লিভার, কিডনী, চর্ম ও যৌন রোগের বিশেষ অভিজ্ঞ

বিঃদ্রঃ (জহুরা মার্কেটের উত্তর পার্শ্বের বিল্ডিং)

শুক্রবারঃ ৪টা-৮টা

মধ্য প্রাচ্য সমস্যার মর্মস্বরূপ কোথায়?

ইবনে বতুতা

“কোন আরব রাষ্ট্রে হামলা করলে ইসরাইলের অর্ধেক ধ্বংস করে দেব।” সুপ্রিয় পাঠক, আমার মত নাদান বাস্তব বুকের এত হিম্মৎ নেই যে, এত বিফোরক মার্কী কথাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেব, অথবা গ্রাম্য নিছক বিতর্কের ঝড় তেঁতার কর-কাহিনীও বলা হচ্ছে না। মধ্য প্রাচ্যের হিরো থেকে জিরোতে পরিণত ইরাকী নেতা সাদ্দাম হোসাইন একদা ৪ হাজার টন রাসায়নিক অস্ত্র ও হাজার খানেক ঝাড় মিসাইলের ডিপোর উষ্মতার জোড়ে ইসরাইলকে তর্জনী তুলে এ কথাগুলি বলেছিলেন।

স্বভাবতই মন চলগিয়েছিলো পাশ্চাত্যের তৃতীয় ক্রসেডার বাহিনীর আক্রমণে বিপর্যয় দ্বাদশ শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস রোমাঞ্ছনে। ইসলামের সেই ঘোর দুর্দিনে প্রবতারার মত অবিরত হলো এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সালাউদ্দিন আইউবী। এই বীর কেশরীর ঘোড়া চালোনা আর অসি চালোনার মুখে ক্রসেডার বাহিনী কচুকাটা হয়ে গেল, মুসলমানরা ফিরে পেল পবিত্র ভূমি জেরুজালেম। আজ আবার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে মুসলিম বিশ্ব আশায় বুক বেঁধেছিলো যে, মধ্য প্রাচ্য যখন পাশ্চাত্য ও ইহুদী শক্তির নখরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে, আবার মুসলমান ভাইদের রক্ত নিয়ে ইসলাম বিদ্বেশীরা যখন হোলি খেলছে, ঠিক তখনই বুদ্ধি তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে অবিরত হয়েছে নব্য সালাউদ্দিন, প্রাচ্যের নতুন সিংহ শাদুলসাদ্দামহোসাইন।

কিন্তু অটীরেই সে আশা মরীচিকার ন্যায় দূর দীর্ঘস্তে মিলিয়ে গেল। সাদ্দাম হোসাইনের পরবর্তী কার্যকলাপ এবং তার ক্ষমতা দখলের ইতিহাস সচেতন মানুষের কাছে খুবই বিস্ময় লাগল। তার বাক্যকে নিছক বাগাড়ম্বর মনে করা ছাড়া তাদের আর

কোন গত্যন্তর থাকল না। উপসাগরীয় সংকটকালে ইসলাম প্রিয় জনতার কাফেলা ইসলামের খাদেম মনে করে যে সাদ্দাম হোসাইনকে নৈতিক সমর্থন জোগাত, রাজপথকে মিছিলে মিছিলে উত্তপ্ত করে রাখত, বুকে সাদ্দামের ছবি এঁটে যারা আত্মাহ আকবর তাকবির ধ্বনি দিয়ে “সাদ্দাম তুমি এগিয়ে যাও, আমরা আছি তোমার সাথে” শ্লোগানে, মুখরিত করেছিল, পরবর্তিতে আহম্মক সাদ্দাম হোসাইনের ইটকরীতায় তাদের সে আবেগ অনুশোচনায় পরিণত হয়, নত শিরে, ভয় মনে ও মূদুপায়ে তারা ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। আলোর পেছনে যে কদাকার অন্ধকার লুকিয়ে থাকে তাও তাদের সামনে উন্মোচিত হয়। সে যে বিভ্রান্তি ও চক্রান্তের শিকার তা আর কারো বুঝতে বাকী থাকলো না।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান নিয়ে মধ্য প্রাচ্যের সিরিয়ায় মাইকেল আফলাক নামক একজন আরব খৃষ্টান পণ্ডিত “বাথ পার্টি” নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। এই পার্টির ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ছিলঃ “ইসলাম কেবল মাত্র আরবদের একটি জাতীয় বিপ্লব। এই বিপ্লবে অনারবগণ শরীক হয়ে একে ঘোলাটে করে ফেলেছে। আরবের মুশরিকরা এই বিপ্লবকে সফল করার জন্য বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে মাত্র। এ বিপ্লবের সাফল্যের জন্য তারাও (মুশরিকরা) বিপ্লবের সহযোগী মুসলমানদের ন্যায় কষ্ট করেছে। অন্য ধর্মের সাথে ইসলামের কোন পার্থক্য নেই। ইসলাম আত্মাহ প্রদত্ত কোন ধর্ম নয়, এ আরবদের স্বাভাবিক জাগরণ মাত্র। আরবরা যখন গাফলতির ঘুম থেকে জেগে উঠছিল, ঠিক তখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং মুসলমানরা নব জাগরণের পুরো কৃতিত্ব দাবী করে।”

মূলতঃ ইসলাম বিদ্বেশী এই খৃষ্টান ব্যক্তিটির ভূমিকা ছিল মুসলিম ছদ্মবেশী ইহুদী পণ্ডিত মুনাক্কে ইবনে সাবার মত। এই ব্যক্তি ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সে অধ্যয়নরত ছিলো। ফ্রান্সের চক্রান্তে ১৯৪৭ সালে সে মধ্য প্রাচ্যের জাগরণশীল ইসলামী আন্দোলনকে বিভ্রান্ত এবং ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন বিরোধী এক রাজনৈতিক দল গঠন করে মুসল-মানদের মধ্যে কৌশলে দাঙ্গা ও হানাহানি সৃষ্টি করে ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করার পায়তারা চালায়। ইসলামের অপব্যাখ্যা ও ইসলামী দর্শন বিরোধী আরব জাতীয়তাবাদ এ দলের মূল আদর্শ হওয়ায় উলামা সমাজ এর কঠোর বিরোধিতা করে। ফলে সচেতন মুসলমানদের মধ্যে এ আন্দোলন কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।। মাইকেল আফলাক তখন তার ভ্রান্ত দর্শন সংখ্যালঘু কটর “দরজী” ও “উলুবী” শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। চরম ইসলাম বিদ্বেশী এ দু’ সম্প্রদায়ের জন্য তার পার্টির দ্বার অবরিত করে দেয়া হয়। অবশ্য মুসলিম নামধারী কিছু নাস্তিককেও সদস্য পদ দেয়া হয়। তবে এরা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্য। মুসলমানদের ধোকা দেয়ার জন্য কিছু সংখ্যক নাস্তিককে পার্টির উচ্চ পদও দেওয়া হয়। মাইকেল আফলাক সংখ্যাগরিষ্ঠ আরব মুসলমানদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য আরব জাতীয়তাবাদের ধূয়া তুলে বাথ পার্টি প্রতিষ্ঠা করলেও তিনি নিজেই ছিলেন ঘোর ইসলাম বিদ্বেশী। খৃষ্ট ধর্মের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ ছিল। যার দরুণ সে প্রায়ই ভ্যাটিকানে পোপের নিকট ছুটে যেত। ১৯৬৮ সালে ইরাকে এবং ১৯৭০ সালে সিরিয়ায় তার প্রতিষ্ঠিত বাথ পার্টি ক্ষমতায় আসলে পর এই সাফল্যের জন্য আফলাককে ‘মানব সেবা’ পদক দেয়া হয়। বেগাট গোত্রের সন্তান সাদ্দাম হোসাইন তখন

সবেমাত্র ঘোঁষনে পদার্পণ করেছেন। এই সময় মাইকেল আফলাকের এ আন্দোলনে সে জড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসের পাতায় সাদামের বেগাট গোত্র "বিশ্বাসঘাতক" হিসেবে চিহ্নিত। তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যে বাস এবং তুর্কীদের অস্ত্র ও অর্থে প্রতিপালিত হলেও হেযাজের শরীফ হুসাইনের ন্যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা তুর্কীদের বিরুদ্ধে বুটেনকে সাহায্য করে। ১৯২০ সালে ইরাকের আলিমগণ যখন একটা জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেন তখন বেগাট গোত্র বুটিশের সমর্থনে লুটপাট, দাঙ্গা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়। সাদামের পিতা ছিলেন বেগাট গোত্রের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। একবার সে নিজ গোত্রের ৩০টি শিশুকে হত্যা করে। তাদের অপরাধ ছিল তাদের পিতা বা মাতা বেগাট গোত্রের বাহিরে বিবাহ করেছিল। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য সাদামের পিতাকে গোত্র থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং সে তিক্রিত অঞ্চলে এসে নতুন গোত্র গড়ে তোলে। এই খুনী পিতার সন্তান সাদাম বাপ্যকাল থেকেই ছিল একঘেয়ে চরিত্রের। যা ভাবত তাই বাস্তবে করত। তা' ভুল হলেও বা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও সম্পন্ন করত। ভয়ভরহীন বিশেষ মানসিক শক্তির অধিকারী, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার সাহস এবং দক্ষতা, সর্বোপরি কথা দিয়ে মানুষকে তুষ্ট করার অপূর্ব দক্ষতা (যা এখনও মাঝে মাঝে শোনা যায়) তার চরিত্রের বিশেষ গুণ। পনের বছর বয়সী সাদাম তার চাচা মিসহিনের সাথে এক ব্যক্তির শত্রুতা থাকায় তাকে খুন করে বাগদাদ পালিয়ে যায়। এ সময়ই সাদাম বাথ পার্টিতে ঢুকে একটি নিজস্ব খুনী বাহিনী গঠন করে। পরবর্তিতে সাদাম বুটিশদের চক্রান্ত ও আর্থিক প্রলোভনে প্রেসিডেন্ট উৎখাতের অভিযান চালায়, কোটিপতি ব্যবসায়ী আদুদুহর ধন সম্পদ লুটে নেয়ার জন্য তাকে সপরিবারে নিজ হাতে খুন করে। এ সব ঘটনায় পার্টিতে সাদামের প্রভাব বেড়ে যায় এবং বুটিশদের সহযোগিতায় মাইকেল আফলাকের সাথে বৈঠক হয়। এ বৈঠকের পর আফলাক সাদামকে নিজ পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করতে থাকে। সাদাম

ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠে, তার খুনী চক্র বার্থ পার্টির অংশ হয়ে যায়। আফলাক এবং বুটিশ সরকার উভয়ের নিকট থেকে সে অটল অর্থ পেতে থাকে। এভাবেই আজকের সাদামের প্রাথমিক জীবন অন্ধকার ও তুর পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত হয়। ইসলাম বিদ্বেষী মাইকেল আফলাকের সান্নিধ্য এসে দার্শনিক সাদাম পরবর্তিতে চরম ইসলাম বিদ্বেষী ভাবধারায় আক্রান্ত হয়। এর প্রতিফলন দেখা দেয় তার ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত পরেই। তখন অত্যন্ত নৃশংসভাবে হাজার হাজার আলিমকে হত্যা করা হয়। সমস্ত ইসলামী দলকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং প্রধান প্রধান সকল বিরোধী নেতাকে ফাঁসি অথবা কারারুদ্ধ করা হয়।

১৯৭৯ সালের ১৭ই জুলাই সাদাম হোসেন ক্ষমতা গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে ৩০ জন কর্মকর্তা এবং একই বছর ২৫শে অক্টোবর ২২ জন উচ্চ পদস্থ সেনা অফিসার ও কমান্ডারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। একই বছর সরকারের ৪ জন মন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ১৯৮৩ সালের ১৯শে জুন সাইয়েদ মহসীন আল হাকীমের পরিবারের ৬ জন আলিমকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। কেবল সরকারের বিরোধীতা করার কথিত অপরাধে। এছাড়াও সে শুদ্ধি অভিযান, ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অসংখ্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সেনা অফিসারকে গোপনে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। সে এত দক্ষতার সাথে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল করে যে, সাদামের পর দেশের নেতৃত্ব দেয়ার মত কোন যোগ্য নেতা গড়ে উঠতে পারছে না। তার স্বৈরাচারী শাসনের অতিষ্ঠ হয়ে কুদীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সাদাম এই কুদীদের দমন করার জন্য ১৯৮৮ সালে মোস্তলে বিখ্যাত নার্ড গ্যাস ও মাস্টার গ্যাস নিক্ষেপ করে ২০ হাজার কুদী নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে। শহরে—রাজপথে লাশের স্তুপ পড়ে যায়। সাদামের ইসলামের প্রতি যদি সামান্য অনুরাগও থাকত তবে তার দ্বারা এ গণহত্যা ঘটতে পারতো না। কেননা ইসলাম যুদ্ধক্ষেত্রেও নিরস্ত্র মুসলমান নারী শিশুকে হত্যা করার অনুমতি দেয়নি। এই সাদাম হোসাইন

পাকিস্তানের কুপরামর্শে এবং অস্ত্রের দাপটে প্রতিবেশী ইরানের ওপর ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। ৮ বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে দেশদুটির অর্থনীতির মেরনদণ্ড ভেঙ্গে যায়, লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়। পঙ্গু হয় আরো কয়েক লক্ষ লোক। আরব বিশ্বের উদীয়মান সামরিকশক্তি মুখ থুবড়ে পড়ে। এর ফলে আমেরিকা—ইসরাইল বাক বাকুম করতে থাকে। ১৯৯০ সালে গোয়াতুমির কারণে এই লোকটি আন্তর্জাতিক সকল মিমামসা বৈঠককে উপেক্ষা করে শক্তির জোড়ে কৃত্রিম সীমান্ত সংকট সৃষ্টি করে কুয়েত দখল করে এবং এই ইস্যুতে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাকে সদলবলে মধ্যপ্রাচ্যে জড়ো হওয়ার সুযোগ করে দেয়। আমেরিকা সেখানে তার শয়তানী খেলের চূড়ান্ত মহড়া দেখায়। যুদ্ধের মাধ্যমে সে আরব দেশগুলি থেকে খরচ বাবদ শত শত কোটি ডলার হাতিয়ে নেয়। সৌদী আরবের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে ১০০০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে। আবার সেই অস্ত্রের মাধ্যমেই সৌদী আরবের সেনাদের কৌশলে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায়, যাতে এ অস্ত্রের চালান দ্রুত ফুরিয়ে গেলে নতুন করে অস্ত্র বিক্রি করতে পারে। আমেরিকা তখন নতুন এমন কতগুলি অস্ত্রের সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করে যা কোন যুদ্ধ ছাড়া পরীক্ষা করা যাচ্ছিল না। ইরাকের অসংখ্য সেনা হতাহত হয়, সামরিক শক্তির চরম ধ্বংস সাধিত হয়। পক্ষান্তরে আরব বিশ্বের চির শত্রু ইসরাইলের অস্ত্র ডাঙার মাফিনী মারগাজে আরও সমৃদ্ধ হয়। অথচ একমাত্র ইরাকের সামরিক শক্তির দ্বারা মধ্য প্রাচ্যের বিষফোড়া ইসরাইলকে শায়েস্তাকরা যেত। এই যুদ্ধের ফলে অনুরত মুসলিম বিশ্বের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়, তেলের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানায় এব বিরূপ প্রভাব পড়ে। ইরাক, কুয়েত ও সৌদী আরবে কর্মরত লাখে লাখে বিদেশী মুসলমান শ্রমিকেরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। কুয়েতকে ধ্বংসস্থাপে পরিণত করে সাদামের পলাতক বাহিনী। সবগুলি তেলকূপে আগুন লাগিয়ে দেয়ায় মুসলিম বিশ্বের শত কোটি ডলার

সম্পদের ক্ষতি হয়। মেটকথা এ যুদ্ধে পাশ্চাত্য সার্বিক লাভবান হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেবল মুসলিম বিশ্ব। আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীর বোমা বর্ষণের ফলে হতাহত হয় নিরীহ ইরাকী মুসলমানরা, ধ্বংস হয় তাদের সম্পদ ও ঘর বাড়ী। আবার ইরাকের ক্ষেপনাস্ত্র হামলায় হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাহরাইন ও সৌদী আরবের বেসামরিক মুসলমানরা। হাতে গোনা কয়েকজন মার্কিন সেনার হতাহতের বিনিময়ে আমেরিকা বিরাট বিজয় ও প্রচুর অর্থ সম্পদ লাভ করে। পক্ষান্তরে ইরাক হাজার বছর পিছিয়ে পড়ে। আমেরিকার পরবর্তী প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের জন্য অসহায় ইরাকী জনগণকেই চরম মূল্য দিতে হচ্ছে, তারা এখনও দুর্ভিক্ষ ও মার্কিনী বিমান হামলায় মারা যাচ্ছে।

সাদ্দাম হোসাইন বাথ পার্টির আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে দেশে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কায়ম করে রাশিয়ান ঘেষা সমাজতন্ত্র। শাসনতন্ত্রে নামে মাত্র ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম রাখা হয়েছে। ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। অন্য কোন মতবাদের সাথে ইসলামকে জোড়াতালি দেয়ার কোন সুযোগ নেই। অথচ সাদ্দাম হোসাইন সুবিধা মাফিক ইসলামী শরিয়াত ও কমুনিজমের সমন্বয়ে একটি সংবিধান কায়ম করেছেন যা, একই পাত্রে শরাব আর সরবত রাখার মত কারবার। সাদ্দাম ও বাথ পার্টির নেতৃত্বাধীন

পররাষ্ট্র নীতি ছিল কো-মকো পররাষ্ট্র নীতি। লেবানন ও প্যালেস্টাইনের মুসলমানদের ওপর ইজরাইলী ইহুদীদের বর্বর দমন, নির্যাতনের পরও ইরাক সর্বদা রহস্যজনক নীরবতা পালন করছে। কাশ্মীরী মুসল-মানদের ওপর ভারত নির্যাতনের ষ্টিম রোলার চালালেও ইরাক বরাবরই ভারতকে সমর্থন জানিয়ে আসছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদ সোভিয়েত ইউনিয়নকে সৈন্য প্রত্যাহারের আহবান সম্মিলিত প্রস্তাব পাস করলে ইরাক এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের পক্ষে ভোট দান করে। এ ছাড়া বর্তমানে বসনিয়ার মুসলিম গণহত্যার বিরুদ্ধে সকল মুসলিম রাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেও ইরাকের কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে না। বাথ পার্টি ফ্রান্সের আর্থিক ও সার্বিক সহযোগিতায় গঠিত হয়েছিল এবং এর সকল নীতি নির্ধারণে ফ্রান্সের অবদান ছিল বলেই উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ফ্রান্সের সাথে ইরাকের ছিল সুসম্পর্ক।

সাদ্দাম হোসাইন কর্তৃক লেখা পার্টির কর্মসূচী ও মৌলনীতি তার আত্মজীবনী ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তার নিজের লেখা প্রবন্ধ ও রচনাবলী অধ্যয়ন কবলে তাব ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনারও একটা ধারণা পাওয়া যায়। তার লেখা 'আল-মাসআলাতুদ দীনিয়াত' নামক বইয়ের ২২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "প্রগতিশীল ধ্যান ধারণার

আবর্তনের মাধ্যমে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার প্রসারতার কারণে বিভিন্ন আরব দেশগুলোতে নানা প্রকার ইসলামী আন্দোলন দানা বেধে উঠতে দেখা যায়।" ২০ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, "ইসলামী আন্দোলনগুলো হচ্ছে বাথ পার্টির অগ্রযাত্রার একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। ইসলামী আন্দোলনগুলি প্রাচীন পন্থীদের আড্ডাখানা। সেখানে হাল জামানার কথাবার্তা খুবই কম শোনা যায়।"

অন্য একটি বই 'নাঈজ রাতুনকিত তুরাহ ওয়াদদীন' এ তিনি লিখেছেন যে, "আমাদের দর্শন ধীনও নয় এবং ঐতিহ্যও নয়, বরং আমাদের দর্শন হল জীবন ও জগতের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর সমষ্টি।" ইরাকী জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন, "তারা ইসলামী জীবন-পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না তারা সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে বাথ পার্টি কর্তৃক গৃহীত কর্ম-সূচীর সাথে অসংগতিপূর্ণ কাজ না করবে।"

সূত্রাং এ কথা বললে অতুক্তি হবে না যে, আজকের উপসাগরীয় সংকটের মূলে রয়েছে ইসলাম বিদ্বেষী চক্র ও পাশ্চাত্যের চক্রান্ত। তারাই সুকৌশলে এ সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং এ সমস্যার সমাধানের নামে মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি সাধন করে চলছে। আজকের ইরাকের সাদ্দাম হোসাইন সে ধ্বংস লীলায় ১নম্বর ঘুটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে মাত্র। [অসমাপ্ত]

এ যুগের অবিস্মরণীয় ঘটনা "আফগান জিহাদের" উপর রচিত।

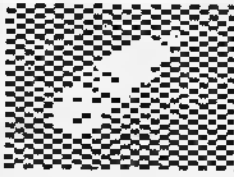
উবায়দুর রহমান খান নদভীর সাড়া জাগানো বই
‘আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি’

বর্ধিত কলেবরে, নতুন সাজে ও পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে আবার বেরিয়েছে।

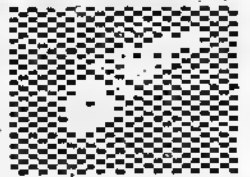
সাদা কাগজে, কম্পিউটার কম্পোজ, অফসেট ছাপা, মনোরম প্রচ্ছদ আর সুন্দর বাধাই এ বইটি প্রতিটি সচেতন মানুষের সংগ্রহে থাকার মতো একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

পরিবেশকঃ আজিজিয়া কুতুবখানা

১নং আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।



আমার দেশের চালাচল



ফারুক হোসাইন খান

সেদিন রাজধানীর একটি সড়ক দিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছি। হঠাৎ করে কিছুটা দূরে একটা বিকট শব্দ ক্রমশ নিকটে আসতে শুনতে পেলাম। তার বিকট শব্দে কর্ণ কুহর ফেটে যাওয়ার অবস্থা। কিছুটা কাছে আসলে দেখলাম, কতগুলি লোক দেদারছে ডাম, ঢোল, কাশা ও বাঁশি বাজাচ্ছে আবাসিক এলাকার রাস্তায়। পেছনে আরো কতগুলি লোক বাদ্যের তালে তালে হৈ হৈ করছে। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম হয়ত হিন্দুদের কোন পূজা-পাঠ উপলক্ষে আনন্দ মিছিল নেমেছে। কিন্তু কাছে আসতে আমার তাক্জব হবার পালা। আরে লোকগুলির মাথায় টুপি, মুখে দাড়িওতো অনেকের! এবার ভুল ভাংলোঃ সামনে একটা প্রাকার্ড “..... বাবার সুভাগমন উপলক্ষে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ।” এতক্ষণে বুঝলাম, লোকগুলি হিন্দু নয় এবং এটা হিন্দুদেরও কোন উৎসব নয়। এটা কিছু সংখ্যক মুসলিম সন্তানের মিলিত একটা অপকর্মা। ধর্মের নামে সূরতি টুপি পরা, দাড়ি ওয়ালা কিছু ভণ্ডের কুকর্ম মাত্র। ঢোল পিটিয়ে গুরা টুপি, বাড়ির সাথে উপহাস করছে, ইসলামকে পৌত্তলিকতার মধ্যে বিলিন করে দেয়ার অপচেষ্টায় মেতেছে। দেশের আনাচে-কানাচে, শহরে-বন্দরে সর্বত্রই এ বাবা, জটাধারী বাবা ও বিভিন্ন “অর্থডিক্স মার্কা” আধ্যাত্মিক পন্থী তথাকথিত গীর-ফকিরের তৎপরতা দেখা যায়। “পবিত্র”, মহাপবিত্র” নামে উদ্ভট ও মনগড়া “ওরশ” নামক হরেক রকমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মদ, গাজা, আফিম সেবনের আড্ডা বসায়, বেগান নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে রাত-দিন বাদ্য যন্ত্র সহ নাচ-গানে মত্ত হয়। তথাকথিত মাজার, দরগাহ ও গীরদের কবরে সেজদার

ভঙ্গীতে মাথা ঠেকিয়ে কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট ধন-দৌলত থেকে গুরু করে হরেক কিছু চাওয়া হয়। উল্লেখিত সকল প্রকার আচার-আচরণ চরম বেদম্মাত এবং কখনও কুফরীর পর্যায়ে দাড়ায়। রাসূল (সাঃ) এর জীবনে তো দূরের কথা সাহাবী, তাবেরীন, তাবের-তাবেইনদের জীবদ্দশায় এর সাথে সহতিপূর্ণ কোন অনুষ্ঠানেরও হিন্দিস পাওয়া যায় না। এই সব গীর-ফকিরদের কথাবার্তাও চরম ইসলাম বিরোধী। কারো মতে, বাবা ভাণ্ডারী মানুষ নয়, আত্মাহুত সত্তা। যা খৃষ্ট ধর্মের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাথে হুবহু মিল রাখে। কেউ বলেন, ঢোল, বাদ্য যন্ত্র নিয়ে আত্মাহুত বন্দনা করলে আত্মাহ বান্দাদের এসকে পাগল হয়ে প্রথম আসমানে হাজির হন এবং বান্দার প্রতি অকাতরে রহমত বর্ষণ করেন। অন্য একদল আছেন তারা হিন্দুদের ত্রিশূলের ন্যায় একটা দণ্ডহাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন এবং কল্পিত গাজী-কালুর গান গেয়ে সরল মানুষকে ধোকা দিয়ে টাকা পয়সা কামাই করেন। এই গান শুনে যারা অর্থ দান করেন তাদের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের যাবতীয় মনের ইচ্ছা নাকি গাজী-কালু অসৌকিক উপায়ে পূরণ করেন। ইসলামী আকিদা অনুযায়ী আত্মাহ পৃথিবীর সব কিছুর মালিক, তিনি যাকে ইচ্ছে দেন বা দেন না। তার এ ক্ষমতায় অন্য কাউকে শরীক মনে করা স্পষ্ট শিরকের সামিল। আর এক দল ভণ্ড বলে থাকেন যে, তাদের নামাজ, রোজা বা ফরজ গোহলেরও প্রয়োজন হয় না। মারেফত বিদ্যা তারা এত হাসিল করেছেন যে, আত্মাহ নাকি এ সব ইবাদাতের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আত্মাহ তাঁর দোস্ত রাসূল (সাঃ)-কে পর্যন্ত নামাজের বাধ্যবাধকতা

থেকে মুক্তি দেননি অথচ এসব শয়তানের চেষ্টাদের ফরজ ইবাদাতের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার দাবী কি চরম কুফরী নয়?

আমাদের নাগালের মধ্যে থেকে প্রতিদিন পৌত্তলিকবাদীদের এই দোষেরা মুসল-মানদের মধ্যে বিস্তারিত ছড়াচ্ছে, বেদাম্মাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইসলামকে উপহাসের খোরাক বানাচ্ছে। অথচ লক্ষ লক্ষ আলিম ও কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান দেশে থাকা সত্ত্বেও এসব ভণ্ডদের ভণ্ডারী রোধ করার মত কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। এটা বড়ই আফসোসের ব্যাপার। আমাদের মনে রাখতে হবে, ছোট ফিতনাকে বাড়তে দিলে এক সময় তা বিরাট ফিতনায় পরিণত হয়। যেমন, কাদিয়ানী ফিতনা, কেরানীগঞ্জের সদরুদ্দিন চিশতির ফিতনা, তাসলিমা নাসরিন, ডঃ আহম্মদ শরীফ, কবির চৌধুরীদের ছোবলকে বিহার কামড় মনে করলেও এক সময় এরা কেউটের আকার ধারণ করতে পারে। সুতরাং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ভ্রান্তির কবল থেকে রক্ষা করতে হলে এক্ষুণি আমাদের যবানের জিহাদ শুরু করতে হবে। কোথায় সেই মর্মে মুজাহিদ আল ফেসানীর (রহঃ)-এর কাফেলা?

এই দেশে একটা তত্ত্ব কামেম আছে। তত্ত্বটার নাম গণতত্ত্ব। এই গণতন্ত্রের মূল কথা হল জনগণের শাসন, জনগণের সরকার, জনগণের আইন। অর্থাৎ সবাই সরকার। তাই বুদ্ধি কারো নিকট কারো জবাবদিহি করতে হয় না। এদেশের গণতন্ত্রকে ভোগতত্ত্ব বা ধনিকতত্ত্ব বলতেও অতুক্তি হবে না। এখানে কেউ সংসদে নির্বাচিত হলেই মোটা অংকের বেতন-

ভাতা, সরকারী ভাড়ী, পেনশন পাবেন, নির্বাহী ক্ষমতার বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধানকে আইনের উর্ধ্বে অর্থাৎ ফেরেস্তা বলে মনে করতে হবে। ক্ষমতায় থাকাকালীন তারা অপরাধ করলে তাদের অপরাধী বলা যাবে না, চুরি করলে চোর বলা যাবে না, তাদের নাম উল্লেখ করে অপরাধের ফিরিস্তি দেয়া যাবে না, তাদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাবে না। সরকারী অফিসার হলেই বৈধ-অবৈধ পন্থায় গাড়ী-বাড়ী থাকতে হবে, মোটা অংকের বেতন তাদের চাই নইলে আন্দোলন করা হবে। দেশের তহবিলে লাগ বাতি জ্বললেও তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।

আসলে এদের দেশপ্রেম নিছক একটা নীতি কথা, তাদের ব্যবহারিক জীবনে এর কোন মূল্য নেই। শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী মোটা অংকের ঘুষ পেলে মার্জার কেসের আসামীকেও ছেড়ে দেবে। ঘুষ দিতে অপারগ হলে নিরীহ লোক এমনকি ফুটপাথের দোকানীদেরও চরম হয়রানী করবে। এমনভাবে দেশে গণতন্ত্রের নামে চলছে এক লুটপাটের তত্ত্ব। এখানে যে যত পারছে লুটপাট করে খাচ্ছে কোন পরোয়া নেই, কৈফিয়ত চাওয়া কেউ নেই। এখানে অর্থের পাহাড় গড়ার সবচেয়ে ভাল পন্থা হল নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়া অথবা সরকারী কর্মচারী হওয়ার একখানা সার্টিফিকেট অর্জন করা। ভাবতেও কষ্ট হয়, যে দেশের নগরীর উন্মুক্ত রাজপথের ওপর তীব্র শীতের রাতেও মানুষ চট জড়িয়ে পড়ে থাকে, বস্তিতে দুর্বিসহ জীবন যাপন করে লক্ষ লক্ষ মানুষ, সেদেশের সরকারী বেসরকারী অফিসগুলি প্রসাদম অটালিকা সদৃশ শীতাতাপ নিরস্ত্রিত, মূল্যবান বিদেশী ফার্নিচার সজ্জিত, অথচ নগরীর মানুষেরা পানি, বিদ্যুতের কষ্টে অতিষ্ঠ তার কোন সন্ধান না করে তিলোত্তমা নগরী গড়ার কৌশল চলে। এ সবই যার যার গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা, অধিকার। নির্বাচনে বিজয়,

অথবা সরকারী লেবেল গায়ে এটে নিয়ে দেশের একটা শ্রেণী ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে, তারা দেশ শাসন করছে, শোষিত হচ্ছে অসহায় জনগণ। নির্বাচিত প্রতিনিধি বা সরকারী কর্মচারীদের কাউকে ফুটপাথে জীবন কাটাতে দেখা যায় না। বস্তিতে বা ফুটপাথে দেখা যায় হতভাগা সাধারণ জনগণকেই। নদী ভাঙ্গন, সড়ক দুর্ঘটনা বা জোতদার মহাজনের অত্যাচারে সর্বস্ব হারালেও তাদের ক্ষতি পূরণ বা একটু মাথা গোজার ঠাই দেবার কেউ নেই। সরকার তাদের সুখ-দুঃখ দেখার জন্য আগ্রহী নয়। পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে সরকারের কোন কোন ব্যক্তি হয়তোবা কখনো ছুটে যায় অসহায় ব্যক্তিদের শয্যাপাশে হাসপাতালে, হাতে গুজে দেয় দু' এক হাজার টাকা। ব্যক্তিটি মনে করে একটা মহৎ কাজ করলাম। আকর্ণ হাসি হেসে কামেরার সামনে দাড়িয়ে সে মহত্বই জাহির করে। আসলে এটা যে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সকলেরই পাওনা তা' তারা স্বীকার না করে রাজনীতির খাতিরে দানবীর হতে চায়। এমনি দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদে পদে গণতন্ত্রের নামে চলছে শোষণ ও স্বার্থ তত্ত্ব, আর সে শোষণের নীকার হচ্ছে অসহায় জনগণ। গণতন্ত্রের নামে জনগণকে এই শোষণ করার প্রক্রিয়া আর কত দিন অব্যাহত থাকবে। আমরা কি পারি না রাজনৈতিক অঙ্গণ থেকে গণতন্ত্র রূপী এই দানবের বদ আছর থেকে মুক্ত হতে? মানবতা, ইসলাম ও রাষ্ট্রের এমন দরদী কেউ নেই যে এ দানবের পরিবর্তে সাম্যের শাসন, ইসলামের শাসন কায়ম করতে পারেন? কোথায় সেই সাইফুল্লাহ যোগ্য উত্তরসূরীরা?

লাখো মুজাহিদ, লাখো মুসলিমের ঢল নেমেছিল সেদিন যশোর টাউনে। বারবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণের দৃশ্য প্রত্যয় নিয়ে তারা গিয়েছিল। মুসলমানদের এ পদযাত্রা ছিল সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ। পথে সামান্যতম কোন

সাম্প্রদায়িক কোন ঘটনাও ঘটেনি। কিন্তু হঠাৎ করে সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী তথা পুলিশ কোন প্রকার উস্কানী ছাড়াই লাখো লাখো নিরস্ত্র জনগণের ওপর গুলি বর্ষণ করে। গুলিতে শহীদ হয় ৫ জন। টিয়ার গ্যাস ও বেধড়ক পিটুনিতে গুরুতর আহত হন বহু। একই সময়ে কেরানীগঞ্জের কুখ্যাত মুরতাদ সদরুদ্দিন চিশতীর শান্তির দাবিতে মিছিলকারী তৌহিদী জনতার ওপর পুলিশ গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান ২ জন নিরীহ লোক, আহত হন অনেকে। উভয় স্থানেই ইসলামের জন্য মুসলমানদের রক্ত ঝরেছে মুসলিম সরকারের অনুগত বাহিনীর হাতে। সন্দেহ হয়, আসলে কি এদেশ মুসলমানের, এ দেশের সরকার কি মুসলমান?

মুসলমানরা তাদের মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে আয়োজন করেছিল ১৭মার্চ, অন্য দিকে ইসলামের বিরুদ্ধে মারাত্মক অপপ্রচার চালানোর বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জে হয়েছিল প্রতিবাদ মিছিল। এদেশের মানুষের ধর্মের ওপর আঘাত আসলে সরকারের যেমনি তার প্রতিবিধান করার দায়িত্ব তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও যদি কোন দেশের মুসলমানদের ওপর কোন গোষ্ঠী বা দেশের পক্ষ থেকে হুমকি আসে বা যদি কোন অপকর্ম ঘটায় তবে তার যথাযথ নিন্দা জ্ঞাপন ও সে সব অপরাধীর সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা। ভারতের হিন্দু পুলিশ, সেনারা উগ্র হিন্দুদের সকল অপকাণ্ডের যেমনি সর্বাঙ্গিক সহযোগীতা করছে তেমনি বিভিন্ন শহরে কার্য্য জারী করে মুসলমানদের নির্বিচারে গুলিকারে মারছে। উভয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের দমানোর চেষ্টা চলছে। এদেশের মুসলমানরা উগ্র হিন্দুদের এসব যাবতীয় অধর্মের প্রতিবাদ করায় মুসলমান পুলিশ বাহিনী তাদের ওপর গুলি ছুড়ে ওপারের হিন্দু পুলিশদের ভূমিকা পালন করে। ভারত সরকার খুশিতে বাগ বাকুম করতে থাকে এ ঘটনায়। এর দ্বারা কি সরকার প্রমাণ করছে না, তারা (১৩ পৃঃ দেখুন)

আধুনিক সভ্যতার স্বর্ণমাসন যাদের হাতে গড়া

মোঃ আঃ আহাদ

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবীর সূরাতের অনুসরণে জীবন গড়ার সুযোগ দান করুন।

এই মুহূর্তে যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, বর্তমান যুগের সভ্য জাতি কারা? সোজা সাঁটা যে জবাব গুলি আসবে তা' হল বৃটিশ, মার্কিনী, ফ্রান্স ও জার্মান। সৌভাগ্যক্রমে দু'একটা ব্যতিক্রমধর্মী জবাবও পাওয়া যেতে পারে। বৃটিশ, মার্কিনীরা বর্তমান যুগের সভ্য হওয়ার কারণ, তারা মহাশূন্যে, চাঁদে ও বিভিন্ন গ্রহে যাচ্ছে, কম্পিউটার, রোবট, টেলিভিশন প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে। বলতে গেলে তারা পৃথিবীকে যান্ত্রিক পৃথিবীতে রূপান্তরিত করেছে। এছাড়া তারা শিল্পোন্নত, শিক্ষিত ও উন্নত জীবন যাপন করে থাকে। এসবই হল তাদের সভ্য হওয়ার পক্ষে মজবুত সার্টিফিকেট।

আসলে আমরা নিজেদের জীবন বিধান ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে শতাব্দী ধরে পশ্চিমাদের ধ্যান-ধারণা ও অনুকরণে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় আমাদের মনে এমন একটা ধারণা বহুমূল হয়ে গেছে যে, এখন আমরা পশ্চিমাদের যাবতীয় কীর্তি-কলাপকেই সভ্যতার উন্নতির পক্ষে ধরে নিচ্ছি। গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে থাকতে এবং পাশ্চাত্যের প্রচারণার সয়লাবে আমাদের চিন্তা-চেতনার এত অবনতি ঘটেছে যে, এখন আর কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ তা' চিহ্নিত করতে পারছি না। এজন্যই পাশ্চাত্য জগত সভ্যতার নামে যে পাপাচার করে যাচ্ছে তার সবটাকে সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করছি।

সভ্য কাকে বলে? যার মধ্যে মানবীয় গুণ অর্থাৎ সভ্যবাদীতা, ক্ষমা, শিষ্টাচার, ভদ্রতা,

লজ্জা, কাম-রিপূতে সংযম, পরোপকার, ন্যায়পরায়নতা আছে এবং যিনি নিরহংকারী, ধৈর্যশীল তাকেই আমরা সভ্য বলে থাকি। তথাকথিত সভ্য জাতির মধ্যে এ সব গুণাবলীর হিটে ফোটাও কি আছে? কালো চামড়ার কারণে একই রক্ত মাংসের মানুষ সাদা চামড়াদের সাথে এক বাসে চড়তে পারে না, এক স্কুলে পড়তে পারে না কেন? তারা আজ বিলাসিতায় আকর্ষণ নিমজ্জিত। বিজ্ঞানীরা নিত্য নতুন বিলাস দ্রব্য আবিষ্কার করছে আর বাকীরা ন্যায় অন্যায়ের তোয়াক্কা না করেই তার ওপর হুমড়ী খেয়ে পড়ছে। সভ্য মানুষকি কখনও বিলাসিতার গোলাম হয়? অথচ অমিতব্যয়িতা, জাকজমকপ্রিয়তা ও আরামপ্রিয়তা তাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হওয়ায় জাপানের মত উন্নত দেশের মানুষদেরও বিলাস দ্রব্য ক্রয়ের লালসায় পর্যাপ্ত অর্থ আয়ের জন্য রাত্রি ১০টা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আবার রাত্রি শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা ছুটতে থাকে রেল স্টেশনে রেল ধরার জন্য। অধিকাংশ গাড়ীতেই দেখা যায় যাত্রীরা দাড়িয়ে থেকেও ঘুমাচ্ছে। অর্থাৎ পর্যাপ্ত ঘুমের সময় তারা পায় না। সপ্তাহের ছুটির দিনে অন্য ছয় দিনের উপার্জিত অর্থ নিয়ে তারা জড়ো হয় বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে। হাত উজাড় করে তারা এদিনটা উপভোগ করে। পরবর্তী ছয় দিন আবার কঠোর পরিশ্রম। জাপানের ন্যায় তথাকথিত সভ্য জাতিরাও অনুরূপ বিলাসিতা নামক সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এক দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে। একেই কি সভ্যতা বলে? এই সভ্য জাতিরা মানুষ মারার জন্য নিত্য নতুন মারণাস্ত্র তৈরি করেছে যার শিকার হচ্ছে কোটি কোটি নিরস্ত্র মানুষ। সভ্যতার জন্য মারণাস্ত্র কি উপকারে আসবে?

আর্থিক প্রাচুর্যতা হাসিলের জন্য সভ্যতার মানসপুত্ররা যত খারাব পছন্দই হোক তা অবলম্বন করাকে দোষের মনে করে না। সুদ ও সুদীভ্রত তাওরাত ও ইজিলে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন তা' ইহুদী ও খৃষ্টান সমাজে দোদীর্ঘ প্রতাপে চলছে। অবাধ যৌনতার কাবণে ভয়ঙ্কর ব্যাধি এইডস এখন পাশ্চাত্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সেখানে মা-বোনেরা গণনারীতে পরিনত হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে একজন চরিত্রবান লোকও সে সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় পাশ্চাত্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ইহুদী প্রোটোকলে লেখা আছে "সর্বত্র আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বত্র নৈতিক ভাঙ্গন ও বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে।" ইহুদীরা এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে নাইট ক্লাব, প্রমোদ তরী, সাজঘর, রূপচর্চাকেন্দ্র, সিনেমা, ভিসিআর, বিমান বালা, কলগার্ল, মডেলিং প্রভৃতি। পাশ্চাত্যের রাজনীতি, অর্থনীতি ও যৌনতার সাথে নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করাকে তারা দোষের মনে করে না। জীবন সম্পর্কে পশ্চিমা সংজ্ঞা হল- 'কেবল ভোগ সন্তোষ ও স্বাদ আন্বাদনই জীবন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাজে পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্ত নাহয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ভোগ সন্তোষে নিমগ্ন থাকা উচিত। মানুষের জীবন ফিরে আসবে না। কাজেই তাকে যত বেশী ভোগ পূর্ণ করা সম্ভব তা' তার অবশ্যই করা উচিত। এজন্য কোন বাধা নিষেধ বা পরাজয় মানা উচিত নয়।'

ভোগের কোন শেষ নেই, ভুগি নেই। মানুষ যত পায় তত চায় এই তার প্রকৃতি। পাশ্চাত্য জগতে এই চাওয়া পাওয়ার কোন সীমা না থাকায় সেখানে অবাধ যৌনাচার গৃহের চত্বর পার হয়ে পার্ক, নদী-সমুদ্রের তীর, স্থল কলেজের ক্লাসরুম পর্যন্ত পৌছেছে। ধর্ম বলতে পাশ্চাত্যের সমাজ শূন্য ডাঙার। ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম অবাধ জীবন যাপনের ধারণার সাথে সংঘর্ষে পরাস্ত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে। উশুঙ্খলতার পক্ষে কতগুলি মর্নগড়া বুলি নিয়ে ধর্ম নামক একটা মহা শয়তানি পাশ্চাত্য সমাজে রাজত্ব করেছে। কল্পিত দেবতার সাথে মানুষ ও বিজ্ঞানের সর্বদা একটা সাংঘর্ষিক চিত্র অঙ্কন করে নিজেদেরকে নিজেরাই প্রতারণা করেছে এই সভ্য জগত। এই সংঘর্ষের মূল কথা হল, "দেবতা বিজ্ঞান বুঝেন না এবং পছন্দ করেন না। যা কিছু ভাল তা মানুষকে দেবতাদের সাথে যুদ্ধকরে হিনিয়ে আনতে হয়। বিজ্ঞানও হিনিয়ে আনা হয়েছে এবং দেবতার চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হয়েছেন। সুতরাং ধর্মেরও মৃত্যু ঘটেছে।"

আধুনিক তথাকথিত সভ্য জাতির এই হল মোটামুটি সর্ধক্ষিপ্ত পরিচয়। তাদের এই সব গুণাবলীকে (?) কি সভ্যতার মাপকাঠি বলা যায়? প্রশ্ন হতে পারে, তারা মহাশূন্যমান আবিষ্কার করেছে, মহাশূন্যে যাচ্ছে, তারা নিত্য নতুন ফ্যাশন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে, তারা তো মানব সভ্যতাকে চরম উৎকর্ষের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। তবুও তারা সভ্য নয় কেন? ভালো পোষাক, বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও মহাশূন্যমান সভ্যতার মাপকাঠি নয়। তা' ছাড়া এগুলির উদ্ভাবক মানুষই চরম অসভ্যতার পথে অগ্রসর হচ্ছে। একটা হায়েনা যদি ভাল পোষাক পড়ে বা মহাশূন্যমানে চড়ে মহাশূন্যে যাত্রা করে তবে তাকে কি সভ্য বলা যাবে? বানর যদি উড়োজাহাজ চালায় তবে সে কি সভ্য বলে গণ্য হবে? পোষাক, যন্ত্রপাতি ও কারিগরী বিদ্যা সভ্যতার উপকরণ মাত্র। আর অসভ্য মানুষ সেই

উপকরণকে নিয়ে মহাকাণ্ড বাধিয়ে দিচ্ছে আর আমরা তাদেরই বাহবা দিচ্ছি "সভ্য" বলে।

তবে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে ইসলাম পৃথিবীতে যে সভ্যতার বুনিয়াদ স্থাপন করে তার চেয়ে ভাল কোন সভ্যতা কোন জাতি বিনির্মান করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। গত শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীতে এই সভ্যতা মানবতাকে মুক্তির আলো দেখিয়ে আসছিল। এত দীর্ঘ সময় পৃথিবীতে কোন সভ্যতা টিকে থাকার নজীর নেই। কিন্তু আমাদের অবহেলা, দুর্বলতা ও পাশ্চাত্যের সর্বান্তক ষড়যন্ত্রের ফলে ইসলামের সরব পদচারণার সাময়িকভাবে বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে পাশ্চাত্যের অসভ্যতা বিশ্বব্যাপী ছেকে বসে। আসলে পাশ্চাত্য জগত আজ যে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার জোড়ে নিজেদের সভ্য জাতি বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছে সে বিদ্যা সম্পূর্ণ মুসলিম জাতির নিকট থেকে ধার করে নেয়া। আমাদের জ্ঞান আমরা সচিবহার না করায় ওরা তা ব্যবহার করে সভ্য জাতি সেজেছে। বিজ্ঞানের জনক ছিল মুসলমানরা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে মুসলমান বিজ্ঞানীদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান। যেমন সময় বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় উপাদান বারুদ, কামান-বন্দুকের ব্যবহার ইউরোপীয়রা মুসলমানদের নিকট থেকে শিখেছিল, মুসলমানদের ব্যবহারের তিনশত বছর পর ইউরোপ এগুলি ব্যবহার করে। যুদ্ধের উন্নত কৌশল ও বারুদ বা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের ওপর লেখা প্রথম ও বিখ্যাত আরবী বই "আল ফুরসিয়া ওয়াল মানাসিব আল হারাবিয়া" মুসলমানদের লেখা। জৌগোলিক গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন জনাব ইবনে ইউনুস। কম্পাস যন্ত্রের আবিষ্কারক ইবনে আহমাদ। জলের গভীরতা ও স্রোত-মাপক যন্ত্রের আবিষ্কারক ইবনে আবদুল মজিদ। জনাব আলফিলি একাই বিজ্ঞানের গবেষণা ২৭৫ খানা বই লিখেছিলেন। বিজ্ঞানী হাসান, আহমদ ও মুহাম্মদ সম্মিলিতভাবে ১০০ প্রকারের যন্ত্র

আবিষ্কার ও ব্যবহার বিধি সম্পর্কে একখানা বই লিখে গেছেন। চিনি আবিষ্কার করেছে মুসলমানরা। আজকের মহাকাশ নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত করেন মুসলমানরা দামেস্ক, কর্ডোভা, সমরকন্দ ও কায়রোয় সর্বপ্রথম মান মন্দির স্থাপন করে। আহমদ আবদুল মজিদের লেখা সমুদ্র যাত্রার বইয়ের ওপর গবেষণা চালিয়ে পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য বাণিজ্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ভান্ডো-ডা-গামার জাহাজের ক্যাপ্টেন ও পথপ্রদর্শক ছিলেন আহমদ ইবনে মাজেদী নামক একজন মুসলমান। পাটিগণিত ও দশমিক গণিত মালা মুসলমানরাই ইউরোপীয়দের শিক্ষা দিয়েছিল। আলকিনির এনসাইক্লোপিডিয়ার ল্যাটিন অনুবাদ পড়ে ইউরোপ মানুষ হওয়ার পথ খুঁজে পায়। ৭০২ সালে তুলা থেকে তুলট কাগজ বানান ইয়াকুব ইবনে আবদুল্লাহ। এর দু' বছর পরে বাগদাদে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। জাবীর ইবনে হাইয়ান ইম্পাত তৈরী, ধাতু শোধন, তরল, বাষ্পীয়করণ, কাপড় ও চামড়া রংকরণ, ওয়াটার প্রফ তৈরী, লোহার মরিচা প্রতিরোধক বাগিশ ও লেখার পাকা কালি তৈরী করে অমর হয়ে আছেন। আলরাজীম্যানিজ-ডাই-অক্সাইড থেকে প্রথম কৌচ তৈরী করেন। পানি জমিয়ে বরফ তৈরিও তার অমর কীর্তি। গণিতবীদ হিসেবে ওমর খৈয়াম এক উজ্জ্বল ডায়র।

রসায়ন বিজ্ঞানেও মুসলমানদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। স্পেন বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইইরোপ পটাশ, এমোনিয়া, নাইটিক এসিড, নাইটো হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কর্পুর সম্পর্কে কিছুই জানত না। ইউরোপের লোকেরা স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে মুসলমানদের নিকট থেকে এর ব্যবহার বিধি শিখে নেয়।

ইতিহাস রচনায়ও সর্বপ্রথম মনোযোগী হয় মুসলমানরা। পরবর্তীতে ইংরেজরা তাদের লেখা কপি করেন। আলবেরনী, ইবনে বতুতা, বাইহাকী, জিয়াউদ্দিন বারনী, আমীর খসরু, বাবর, আবুল ফজল,

ফিরিস্তা, বাদাউনি, কাফি খা' প্রমুখ পৃথিবীর ইতিহাস শাস্ত্রের উজ্জ্বল প্রতিভা।

চিকিৎসা শাস্ত্রে ইবনে সিনার নাম অবিস্মরণীয়। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা রোগ নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কারক আলবেরুনী। চক্ষুর পর্দায় পতিত আলোক রশ্মির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়ায় আমরা দেখতে পাই; ইবনুল হাসাম এ সূত্র আবিষ্কার করার পর ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়েছে। জাবের ইবনে হাইয়ান অস্ত্র পাচারের পূর্বে রোগীকে অজ্ঞান করার ঔষধ আবিষ্কার করেন।

মুসলমানরা সর্বপ্রথম আবাসিক হাসপাতাল ও সামরিক বাহিনীর সাথে প্রমিত হাসপাতাল স্থাপন করে। চশমাও মুসলমানদেরই আবিষ্কার। মানুফুরিয়ার উদ্ভিদের প্রাণ আছে আবিষ্কারক। আল্লামা আলাউদ্দিন কারশি রক্ত প্রবাহের আবিষ্কারক। ১৭১৭ সনে তুরস্কে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের পত্নী বসন্তের টিকা তুরস্ক থেকে নিয়ে প্রথম ইংল্যান্ডে প্রচলন করেন।

আলম্বকানী কপারনিকাসের বহু পূর্বেই পৃথিবী ও নক্ষত্রের আকর্ষক গতি প্রমাণ

করেছিলেন। ঘড়ি আবিষ্কার করেছিলেন কুতুবী। পৃথিবীর নির্ভুল ক্যালেন্ডার আবিষ্কার করেন ওমর খৈয়াম। স্পেনের কর্ডোভার রাস্তায় সরকারী বাতি স্থানান্তর ৫০০ বছরের পর লণ্ডনের রাস্তায় সরকারী বাতি স্থলেছিল। আধুনিক শিক্ষার নিয়ম কানুন, লাইব্রেরী পঠন পরিকল্পনা, শ্রেণী বিভক্ত বিদ্যালয়, আবাসিক বিদ্যালয় প্রভৃতি স্পেন থেকে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সিসিলির সালেমো আর স্পেনের কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে পরবর্তিতে প্যারী মন্ট পলিয়ে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় আজও সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানের আলো ছড়চ্ছে। বীজ গণিতের জন্মদাতা খলিফা মামুনের লাইব্রেরিয়ান মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খারেজমী। তিনি অঙ্ক শাস্ত্রের (০) শূন্যেরও জন্মদাতা।

কবিতা ও সাহিত্যকর্মেও মুসলমানরা সে যুগে বিখ্যাত ছিল। হযরত মুহাম্মদ সাঃ-এর বাণী (হাদীস) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে বিবেচিত। এছাড়া আলী (রাঃ), আল মামুন, ওমর খৈয়াম, রুমী, হাফিজ, শেখ সাদা, ফেরদোসী প্রমুখ ছিলেন

বিশ্বখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক।

মোটকথা, আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলো মুসলিম জাতি। ইউরোপীয়রা মুসলমানদের নিকট থেকে যাবতীয় জ্ঞান আহরণ করেছিল শুধু ইসলাম গ্রহণ করেনি। পরবর্তিতে তারা মুসলমানদের অবদান অস্বীকার করে সভ্যতা নির্মাণের যাবতীয় কৃতিত্ব নিজেদের বলে দাবী করে। আর আমরা মুসলমানরা আমাদের অতীত ইতিহাস ভুলে গিয়ে পশ্চিমাদের তালে তাল বাজাচ্ছি। এই ব্যাধি খুবই আশংকাজনক। এর ফলে আমাদের সমাজ থেকে নিজস্ব সংস্কৃতি, সাহিত্য, ঐতিহ্য, কৃষ্টি সবকিছু মুছে যেতে পারে। আমাদের একুশি সচেতন হতে হবে। সভ্যতা নির্মাণে মুসলিম মনীষীদের অবদানের কথা স্মরণ করে আবার আমাদের গৌরব পুনরুদ্ধারে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। পাশ্চাত্যের নোংরা মী ও অসভ্যতার মোকাবিলায় আমাদের পুণরায় শ্রেষ্ঠ সভ্যতা বিনির্মাণের কঠোর সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে। কোথায় এই সিসাঢালা প্রাচীর অতিক্রম করে জাতিকে স্বর্ণালী সোপানে পৌঁছে দেয়ার দুঃসাহসী সংগ্রামী সৈনিকগণ?

প্যারাডাইস অপটিক্যাল কোং

চশমার জগতে একটি নতুন নাম
প্রত্যহ বিকালে চক্ষু বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন

২, পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১০০

ফোনঃ ২৮২৪৮৩

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব যৌক্তিকতা

মাওলানা হিফজুর রহমান

পৃথিবীতে একটি কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এজন্য প্রয়োজন যে, আপ্লাহ প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে উপকৃত হতে হবে— যা প্রতিটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। কিন্তু জীবন ও জীবনোপকরণের সাথে যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি বা অনুভূতির সংঘাত বাঁধে তখন প্রকৃতির বিধান যা আপ্লাহ তায়ালার তরফ থেকে সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তা প্রতিটি মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবন—যাপনে বাধ্য করে। কিন্তু ন্যায়নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা না থাকলে উক্ত সমাজবদ্ধ জীবন ব্যবস্থার কথা কল্পনাই করা যায় না। বস্তুত ন্যায়নীতি ও জীবনধারার ক্ষেত্রে সাম্যই হবে উক্ত ব্যবস্থার চাবিকাঠি। আর মানব জাতির জীবন ব্যবস্থায় নিম্নের নীতিগুলো কার্যকর থাকলেই সমাজদেহে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

১. উক্ত ব্যবস্থাকে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির জীবনোপায়ের জিহাদার হতে হবে। তার কর্মক্ষেত্রে কেউ যাতে জীবনোপায় থেকে বঞ্চিত না হয়, এই নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

২. যেসব উপকরণ অর্থনৈতিক প্রাধান্যের সুযোগ সৃষ্টি করে, মানব সমাজে শোষণ—নির্যাতনের পথ উন্মুক্ত করে এবং অর্থ ব্যবস্থার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো নিষ্পত্তি করতে হবে।

৩. সম্পদ ও সম্পদ—উপকরণ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর কৃষ্ণিগত হওয়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা শ্রেণীকে সমাজের কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে উক্ত বিশেষ শ্রেণীর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার

হাতিয়ারে পরিণত হবে না।

৪. শ্রম ও পুঞ্জির মধ্যে সুষ্ঠু ভারসাম্য কাম্যে করতে হবে এবং এককে অপরের সীমানায় অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখতে হবে।

অর্থনীতির আধুনিক চিন্তাধারা

উপরোক্ত নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে লক্ষ্যীয় বিষয় হলো, বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে অর্থনীতি বিদ্যা সম্পর্কে যেসব খুটিনাটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তার সারাংশ। অর্থনীতি সম্পর্কে যেসব দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায়, তা হলো তিন প্রকারঃ অতি প্রাকৃতিক জ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ, প্রাকৃতিক জ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ। অর্থনীতিবিদরা এগুলোকে যথাক্রমে মানদণ্ডিক বা আদর্শিক দৃষ্টিকোণ, বিন্যাসিক দৃষ্টিকোণ ও বস্তুগত দৃষ্টিকোণ বলে অভিহিত করেছেন। মানদণ্ডিক বা আদর্শিক অর্থনীতি কাকে বলা হয়, একজন অর্থনীতিবিদের ভাষায় দেখুন। তিনি বলেছেনঃ

মানদণ্ডিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য বর্তমান জীবনোপায়ের ব্যাখ্যা—বিশ্লেষণ প্রদান করা নয়। সুষ্ঠু জীবনোপায় অন্বেষণই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অর্থনীতি নামীয় যন্ত্রটির বিভিন্ন অংশ কিভাবে কাজ করছে, শুধু এইটুকু জানিয়েই সে সন্তুষ্ট নয়। সে জানতে চায়, অর্থনীতি যন্ত্রটি কিরূপ হতে হবে।

মানদণ্ডিক অর্থনীতির দৃষ্টি অনেক উচ্চ। সে অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রত্যাশী। আর এই উদ্দেশ্য নির্ধারণকে সে 'ইক্ব' বা জ্ঞান-চর্চা বলে অভিহিত করে। যেসব চিরন্তন আইন-কানুন নৈতিক জগতে প্রচলিত ও মানব জাতির জীবনোপায়ের

পরিমণ্ডল এবং যেসব আইন-কানুন তদ্বারা পরিচালিত, সেগুলো অনুসন্ধান করা পরিমাপগত অর্থনীতি নিজে দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করে। আর এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুষ্ঠু জীবনোপায় খুঁজে বের করা। অর্থাৎ সে জীবনোপায় মানুষের জীবন ও জগতের লক্ষ্যানুগ হবে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। বস্তুত এই সুষ্ঠু ও কল্যাণকর জীবনোপায়ই সেসব পরিমাপের বস্তুবিশেষ। এটা পরিমাপ বা নির্ণয় করার পর অন্যান্য সকল সমস্যা, যেমন সংগত ও সঠিক পারিশ্রমিক, সম্পদের সংগত ও সঠিক বন্টন, সুদের বৈধতা—অবৈধতা—সব কিছু এমনি মীমাংসা বা সমাধান হয়ে যাবে।

মানদণ্ডিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে তাদের ব্যবস্থায়ই সুষ্ঠু ও উন্নতমানের জীবনোপায় রয়েছে। বাকি সব এর চাইতে নিম্নমানের এবং এর অধঃস্তন অর্থনীতির কাজ হলো এ আরো উন্নতমানের অনুসন্ধান করা। উন্নতমানের সাথে নিম্নমানগুলোর সংগত ও সমন্বিত রূপ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। আর যেসব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারা সেগুলোকে উন্নতমানের কণ্ঠপাথরে পরখ করে তাব মধ্যে ভাল-মন্দ ও গুণগুণের ফয়সালা করবে।

বিন্যাসিক অর্থনীতি প্রকৃতি বিজ্ঞানেরই একটা শাখা। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর বিন্যাসিক অর্থনীতির ইমারত গড়ে তোলা। কিন্তু জমজবনে 'সবক' জীবন-ব্যবস্থা বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও এর ভিত্তিটা যে কি, উক্ত লেখকের ভাষায় তা

প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি বলেছেনঃ

উপরোক্ত তিনটি গ্রুপের (কল্পিত, স্থাপিত ও গণিতিক) মধ্যে সায়ুজ্যতা হলো এই যে, এগুলো দর্শনের চাইতে ইলুম বা জ্ঞানের অধিক সমর্থক। অর্থাৎ 'আছে' বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে চায়। যা হওয়া উচিত তার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে না। সকল প্রকার অভিজ্ঞতা বহির্ভূত ও অতি প্রাকৃতিক উপাদান থেকে নিজের জ্ঞানকে পুত-পবিত্র রাখতে চায়। এসব গ্রুপ অর্থনীতির ক্ষেত্রে নৈতিক বিধি-বিধানের চরম বিরোধী। —

তাদের নিকট প্রকৃতি বিজ্ঞানই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান। এই জ্ঞানকে সকল জ্ঞান, বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এ জন্যই নিব্যাসিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য হলো, 'আইন-কানুন' প্রণয়ন করা। যাতে প্রতিটি অর্থনৈতিক বিষয়কে কোন আইনের অধীনে বিশেষ একটি অংশ হিসাবে আনা যায়। এটাই তাদের নিকট তাত্ত্বিক জ্ঞানের পুজি।

ইউরোপের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরা উপরোক্ত মতবাদ সমর্থন করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, জন স্টুয়ার্ট মিল (Jhon Stuart mill), কার্ল মিংগার (Cirl minger), কার্ল মার্কস (Carl marx), প্যারিটো (Parito) প্রমুখ।

বস্তুগত অর্থনীতিকে 'ইলুমে তামাদুনের' একটা অংশ মনে করতে হবে। আর মানুষের হাতে সৃষ্ট ও পালিত-পালিত সব কিছুকেই এখানে তামাদুন বলে বুঝান হয়েছে। কেননা, বস্তুগত বিদ্যার বুনিয়েদ এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সমশ্রেণীকে বুঝা সমশ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব। নিম্নলিখিতভাবে এ কথার ব্যাখ্যা করা হয় এইভাবেঃ

বস্তুগত বিদ্যার এই দার্শনিক মতবাদ দাড় করান হয়েছে কতগুলো মৌলিক চিন্তা-ভাবনার উপর। আর তা হলো, সমশ্রেণী সম্পর্কে জ্ঞান অর্থাৎ সমশ্রেণীকে বুঝা সমশ্রেণীর জন্যই সম্ভব। আর যে বস্তুটি

আমরা তৈরী করতে পারি তা আমরা সবদিক থেকে পুরোপুরি জানতে ও বুঝতে পারি। আর তামাদুনিক বা সামাজিক অবস্থা অনুধাবন প্রচেষ্টায় যেহেতু বোধশক্তি অন্তরের এবং অনুধাবিত বস্তুটিও অন্তরেই রূপ লাভ করে সেদিক থেকে উভয়টিই সমশ্রেণীর। এই জন্যই তা পুরোপুরি বুঝা বা অনুধাবন করা সম্ভব। আর পুরো তমাদুন বা সমাজই মানুষের হাতে তৈরী ও পালিত পালিত। সে-ই এটাকে গড়ে তুলেছে। এ জন্য সে এটাকে অনুধাবন করতে সক্ষম। অপরদিকে 'প্রকৃতি' মানুষের অনুভূতির বাহ্যিক রূপ নয়, এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশের বাহ্যিক বা বাস্তব রূপ। 'প্রকৃতি' মানুষের তৈরী ও পালিত-পালিত নয়। সে জন্য প্রকৃতিকে বুঝা বা অনুধাবন করা, তার সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করা মানুষের অনুভূতি শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু বস্তুগত অর্থনীতি জীবন ব্যবস্থার শুধু একটি অংশ বুঝতে চায়, অনুধাবন করতে চায়। নাগরিক জীবন কিংবা মানব জীবনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে অনুসন্ধান চালাতে চায় না।

এ জন্যই বস্তুগত অর্থনীতি দর্শন, অতিপ্রাকৃতিক কিংবা ধর্ম নয়। সোজা কথায় এ হচ্ছে অভিজ্ঞতাপ্রসূত, শ্রেণীগত ও সামাজিক জ্ঞান।

এই হলো অর্থনৈতিক বিদ্যার আধুনিক চিন্তাধারা বা মতবাদ—যা নিয়ে আজ গর্ব করা হচ্ছে এবং এটাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান হিসাবে মর্যাদা দেয়া হচ্ছে।

ইসলামী ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ

কিন্তু ইসলামী 'জীবনোপায় ব্যবস্থার' সীমারেখা উল্লেখিত মতবাদ বা চিন্তাধারার চাইতে অনেক প্রসারিত এবং এর চিন্তার ব্যাপ্তি তা থেকে অকে উঠে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মানদণ্ডিক নীতিমালা উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও আরো অনেক কিছু রয়েছে। অনুরূপভাবে বস্তুগত দৃষ্টিকোন

থেকেও সে অনেক ব্যাপক এবং অনেক কল্যাণকর কর্মপদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা।

দৃষ্টান্তরূপ বলা যায়, মানদণ্ডিক অর্থনীতির মৌলিক ধারণা হচ্ছে কল্যাণকর জীবনোপায়ের পরিকল্পনা। কিন্তু পিছনে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 'কল্যাণকর জীবনোপায়ের' যে বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে, তার চাইতে বেশী কল্যাণকর জীবনোপায়ের ধারণা কি কেউ কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেখাতে পারবে? কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিন্তাধারা কি এতো উচ্চতে পৌছতে সক্ষম হয়েছে? ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রয়োজন মেটানোর মধ্যকার ব্যবধান দূর করাই নয়, বরং এটা বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী, সমবেদনা, নৈতিক উন্নতি ও চিরন্তন সুখ-লাভের মাধ্যমও বটে।

বস্তুগত অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ, চিন্তা ও গভেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে বর্তমান কার্যকর অর্থনীতি। এটাই তার মেরুদণ্ড ও কেন্দ্রবিন্দু। এ জন্যই সমাজের এই অধ্যায়টিতে সে শ্রেণীগত, নাগরিক ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত—এই তিন প্রকারে কার্যকরী করে। কিন্তু আমাদের সামনে আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সমাজের এই অধ্যায়টির সুন্দর ও অনুপম সমাধান দিয়েছে। শ্রেণী সঙ্গ্রাম ও পুঞ্জিবাদের প্রভাববলয় থেকে দূরে রেখে অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার কষ্টিপাথরে যাচাই বা পরীক্ষা করে সে যেরূপ সমাধান দিয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন কর্ম ব্যবস্থাই তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

অবশিষ্ট রইল বিন্যাসিক অর্থনৈতিক চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারা তার দার্শনিক ও প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণের দিক থেকে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তাধারা হতে স্বতন্ত্র। বলা চলে সম্পূর্ণ বিপরীত। অবশ্য এর কিছু কিছু খুঁটিনাটি ভাপ দিকও রয়েছে। এগুলো উক্ত

চিন্তাধারা থেকে পৃথকভাবেও স্বতন্ত্র মর্যাদা রাখে। তবে এগুলো ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও রয়েছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, অর্থনীতির দৃষ্টিতে সংবার আগে প্রয়োজন মেটানোর উপকরণগুলোর মধ্যকার ব্যবধান দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর যে কোন রূপেই হোক, এইসব কাজে অসম্পূর্ণতা-সম্পূর্ণতা এবং উন্নতি-অবনতি হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী ব্যাপার। এজন্যই এমন একটি দর্শনের প্রয়োজন যা বিনিময়িক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করবে এবং সে সবার অসম্পূর্ণতা ও সম্পূর্ণতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করবে। আর এটা ইসলামী অর্থনীতিতে যদিও কোন বিশেষ বিদ্যা বা বিষয়ের মর্যাদা রাখে না, তবুও হযরত শাহ্ ওয়াশিউল্লাহ (রঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তিনি এটাকে 'ইব্তেহাকাত'^৪ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এর বিভিন্ন স্তরও নির্ধারণ করেছেন। এগুলোকে 'বাস্তব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা' প্রভৃতির জন্য উপায় বা মাধ্যম হিসাবে মর্যাদা প্রদান করেছেন। অবশ্য বর্তমান অর্থনীতি বিদ্যার এই চিন্তাধারা জ্ঞানের একটি বিষয় হিসাবে ইসলামী অর্থনীতিতে কোন গুরুত্ব বহন করে না। সে এসবের পরিবর্তে এমন সব নীতি ও সেসবের অধীন এরূপ কার্যকর ব্যবস্থার পক্ষপাতি যা মানব জাতির ব্যাপক কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। অর্থনীতির যাত্রাপথে মানব জাতি যাতে সবল ও দুর্বল, অত্যাচার ও অত্যাচারিত ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত না হয় সে ব্যবস্থা এর নিচয়তা বিধান করবে।

অভিজ্ঞতা স্বাক্ষর দিচ্ছে যে, আধুনিক যুগে অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অর্থনীতি বিদ্যা একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এটা 'ইউরোপের ইতিহাস' এ বিষয়ে বিরাট বিরাট গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও অর্থনীতি শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য

ও উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধন আজ পর্যন্ত রূপকথার গুপুপাখি হয়ে আছে। ধন-সম্পদ ও তার উপকরণ একটা বিশেষ শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের জীবন মৃত্যুর চাইতেও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপর দিকে মহানবী (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদার আমলে অর্থনীতির এত সব তত্ত্বকথা ছিল সম্পূর্ণ কমনাভীত ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রে একটা অনাবিল স্বচ্ছল অবস্থা বিরাজিতছিল। মুসলিম, কাফির, মুমিন, মুশরিক, নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষে সবাই সুখ-শান্তি ও স্বচ্ছলতার জীবন যাপন করছিল। ইতিহাসে দেখা যায়, এক পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষ তার দানের সম্পদ নিয়ে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু তা গ্রহণ করার কোন লোক পাওয়া যেতেনা।^৫

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

এছাড়া এই বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, পৃথিবীতে কোন কাজই উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে না। প্রতিটি কাজের পিছনে একটা বিশেষ মানসিকতা কাজ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কল্যাণকর-অকল্যাণকর হওয়ার পরিমাণও তার উদ্যোগ ও উদ্দেশ্যের ভাল-মন্দ হওয়ার উপর নির্ভর করে। যদি তার পিছনে খারাপ মানসিকতা কার্যকর থাকে, তাহলে পুরো উদ্যোগটাই খারাপ বলতে হবে। আর এরূপ অবস্থায় নিঃসন্দেহে উক্ত 'ব্যবস্থা' মন্দ ব্যবস্থা। যদি কোনো ব্যবস্থার পিছনে ভাল মানসিকতা কাজ করে এবং তার উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য সবই ভালো হয়, তাহলে উক্ত ব্যবস্থা বা পদ্ধতি কল্যাণকর হওয়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করারও অবকাশ নেই।

এই নীতির প্রেক্ষিতে আমরা যখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছি তখন এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাই, তখন তার উদ্যোগ, উদ্দেশ্য ও

পিছনে কর্মরত মানসিকতাকে দুটি অবস্থায় সীমিত দেখতে পাই। তার মধ্যে একটি হলো, অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তার মধ্যে বিনিময় ও দর কষাকষির চেতনা জাগিয়ে রাখতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে মুনাফাবাজির 'আরো চাই, আরো চাই' শ্লোগানকে কোন পর্যায়েই কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এই চিন্তাধারাই পুঞ্জিবাদী ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে এবং এর ছত্রছায়ায় উক্ত ব্যবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানী কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও বাজারে আরো অগ্রগতি চাচ্ছে। তার আরো অর্থ চাই। কারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে পরিবেশে সে ব্যবসা করছে তার বিনিময় হচ্ছে অধিক মুনাফা ও দরকষাকষি। এই ব্যবস্থা ধনীকে আরো ধনী করে। অন্যদের নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করে তোলে। এখানে প্রয়োজন মেটানোর চেতনা কাজ করে না, যা সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণ ও সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের বার্তা বয়ে আনবে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পিছনে কার্যকর অপর দিকটি হলো, এই ব্যবস্থার চেতনা ও উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয় বরং মানব জীবনের প্রয়োজন মেটানোর ও অভাব দূর করাই এর লক্ষ্য। আর এজন্য শুধু ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর মানসিকতাই এর পিছনে কাজ করে। তাতে অধিক মুনাফা অর্জনের কোন অবকাশ নেই।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরোক্ত দুটি মানসিকতা কিংবা চেতনার মধ্যে ইসলামী অর্থনীতি শুধু একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামের এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিনিময় হলো, মানব জাতির ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন মেটানো এবং অভাব-অনটন দূরকরা। ইসলাম অর্থনীতিকে বিস্তারিতভাবে মনে মুনাফা হুটান অভিযোগভার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় না। সে এটাকে অভাব মোচন ও প্রয়োজন মেটানোর একটা

কল্যাণকর মাধ্যমে রূপান্তরিত করে সবার জন্য অব্যাহত করার পক্ষপাতি। এ সম্পর্কে মাওলানা আবুস কালাম আজাদ বলেছেন:

(ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার) অবশ্যই অধিক উপার্জনকারী সদস্য থাকবে। কারণ রক্ষী-রোযগার ব্যতিত কোন মানুষই জীবিত থাকতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি যতো উপার্জন করবে, সে পরিমাণ ব্যয় করতেও সে বাধ্য থাকবে। তাতে করে ব্যক্তির রোযগার যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্যও সে পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যোগ্য ব্যক্তির অধিক পরিমাণে উপার্জন করবে। কিন্তু তারা শুধু নিজের জন্য উপার্জন করবে না, সে উপার্জন হবে জাতির প্রতিটি লোকের জন্য। এক শ্রেণীর উপার্জন অন্য সবার জন্য দারিদ্র্যের সংবাদ বয়ে আনবে, যা বর্তমানে সাধারণত হচ্ছে (ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার) কোনো এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না।^৬

উল্লেখিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিষ্কার প্রতিভাত হয়েছে যে, ইসলামী

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কল-কল্যাণলো কল্পন অনুপমভাবে সাজান হয়েছে। এর ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি এমন সব সুশৃঙ্খল আইন-কানুন ভিত্তিক যা শুধু প্রকৃতি বিজ্ঞান পর্যন্ত এসে থেমে যায় নি, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হয়ে ধর্ম তথা আত্মার বিধানের অধীনে অস্তিত্ব লাভ করেছে। ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণকর কতকগুলো নীতি হচ্ছে এই ব্যবস্থার প্রেরণা শক্তি। এসব নীতির দৃষ্টিতে অর্থ ব্যবস্থা হলো অভাব-অনটন দূর করা ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য। অধিক মুনাফা ও লাভ অনুসন্ধানের জন্য নয়। বলা বাহুল্য, এধরনের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব পৃথিবীর জন্য নিঃসন্দেহে আশীর্বাদ ও শুধুই কল্যাণকরবার্তাবহ।

সারকথা, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা। তাতে অর্থনীতি বিদ্যার প্রাচীন ও আধুনিক, ধর্মীয় ও যৌক্তিক সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এমনকি এই ব্যবস্থা তার চাইতেও অনেক বেশী সৌন্দর্যের অধিকারী এবং অপরাপর

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি থেকে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মুক্ত। বলা চলে, এটা সেসব ব্যবস্থার বিধাত প্রভাবের নজিরবিহীন প্রতিষেধক। সকল সৌন্দর্য ও গুণাবলী ছাড়াও এই ব্যবস্থার আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা মানুষের মস্তিষ্কের গড়া নয়। আর মানুষের গড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে প্রতিশোধ কিংবা শ্রেণীগত বিদ্বেষের মত অপরিপক্ব বিষয়। বস্তুত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো বিশ্বের স্রষ্টা আত্মাহ তায়ালার গড়া ব্যবস্থা।

অনুবাদ: মাওলানা আব্দুল আউয়াল

১. অর্থনীতি: উদ্দেশ্য ও স্তর, ডঃ জাকির

হোসেন, পৃঃ ১১-১২।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭।

৩. পূর্বোক্ত পৃঃ ৭৯-৮০।

৪. আরবী-ইসলামীক শব্দের বহুতল ইরতেফাকাত এর অর্থ উপকৃত হলো - অনুবাদক

৫. আল-বিদায়া উমান-নিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪।

৬. তরজুমানুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩২।

মধ্যপ্রাচ্যসহ যে কোন দেশের ভিসার প্রসেসিং দ্রুত করার
নিশ্চয়তা আমাদের অঙ্গীকার



ফমিরা ওভারসীজ
FAMIRA OVERSEAS

Recruiting Licence No.-RL-F-178

Phone Off-243561, 281067, 243567, 237346 Res. 418021
Tlx-632162 CONTL JB FAX-880-2-863379, 863170, 863317, 405853
8/2 Purana Paltan, North-South Road, Dhaka-1000
G. P. O. Box No. 854 Dhaka

ইমাম বুখারী (রাহঃ)

মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

নীল আকাশের রূপালী চাঁদোয়ার নিচে আর সবুজ গালিচার এ পৃথিবীর বুকে পবিত্র কুরআনের পর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হলো সহীহ আল বুখারী। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর এক ক্ষণজন্মা মহা পুরুষ, হাদীসের ক্ষেত্রে এক জগত জোড়া নাম ইমাম মোহাম্মাদ বিন ইসমাইল এর অবদান অবদান এই গ্রন্থ। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে ইমাম বুখারী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাবো।

ইমাম বুখারীর পুরো নাম আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে, বারদযিবা আল বুখারী। হাদীসের জগতে তিনি "আমিরুল মোমেনীন" উপাধিতে ভূষিত। তাঁর পিতা ইসমাইল একজন বিশিষ্ট মুহাদিস, খোদা ভীরু ও ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভোগ লিপ্সা ও লোভ লাভসাকে ঘৃণা করতেন। সম্পদের মোহ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি কখনো। জনৈক মুহাদিস বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাইলের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর মুমূর্ষ কণ্ঠে শুনেছি, আমি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলাম, অনেক সম্পদ রেখে গেলাম। কিন্তু আল হামদুলিল্লাহ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহতার অবকাশ নেই। তার এই উক্তি থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, ইমাম বুখারীর রক্ত দেহ ও মস্তিষ্ক কেমন পুত হাসান উপকরণে গঠিত হয়েছিল।

ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল শুক্রবার বাদ জুমা ঐতিহাসিক বুখারা শহরে জন্ম লাভ করেন। শিশু কালেই তিনি পিতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। তাই

তার মমতাময়ী মাতা তার লালন পালন ও প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারীর মাতা অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ, পুণ্যবতী ও বিদুষী ছিলেন। শিশু কালে ইমাম বুখারী দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ দুর্ঘটনায় তাঁর প্রতি মায়ের মমতা উথলে উঠল। তিনি শোকাহত হৃদয়ে আল্লাহর দরবারে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আকুল প্রার্থনা জানান। মাতৃ হৃদয়ের আবেগ কাতর প্রার্থনার ফলে আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়ে এত তীক্ষ্ণ ও প্রখর করে দেন যে, ইমাম বুখারী তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "তারিখে কাবীর" রচনার কাজ চাঁদের আলোতেই সমাপ্ত করেন। স্নেহময়ী মাতার তত্ত্বাবধানে ইমাম বুখারী স্থানীয় শিক্ষাঙ্গণে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধাবী, বিরল প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের এবং বিশ্বকর স্মরণ শক্তির অধিকারী। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের সমস্ত কিতাব মুখস্ত করে ফেলেন। তখন থেকে তাঁর মনে হাদীস চর্চার এক অদম্য প্ৰাণ জাগ্রত হয়। তিনি নিজে বর্ণনা করেন যে, "আমি মক্কেতে শিক্ষাবস্থায়ই হাদীস চর্চার প্রতি অনুপ্রাণিত হই।"

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ইমাম বুখারী বুখারা নগরীর স্বনামধন্য মুহাদিস গণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হাদীস চর্চায় বৃত্ত হন। হাদীস চর্চার সূচনাতেই তিনি যে চরম অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার পারাকটী দেখিয়েছেন নিম্নের ঘটনা থেকেই তা বুঝা যায়:

মুহাদিসের দরসে হাদীসে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। অন্যান্য সকলেই হাদীস লিখার প্রতি চরম গুরুত্ব আরোপ করলেও ইমাম বুখারী সেদিকে মোটেই ভ্রক্ষেপ করতেন না তিনি হাদীস লিখতেন না। এ ভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ কেউ তাকে তিরস্কারের সুরে বলতেন যে, তুমি যখন হাদীস লিখছ না তাহলে অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ কি? তদুত্তরে ইমাম বুখারী বললেন যে, আচ্ছা তাহলে তোমরা যে সমস্ত হাদীস লিখেছ প্রত্যেকেই তার এক এক কপি হাতে নাও এবং সমস্ত হাদীস আদ্যোপান্ত আমার কাছ থেকে শুনে আপন আপন কপি সংশোধন করে নাও। ঠিক তাই হলো। একই বৈঠকে ইমাম বুখারী ৭০ হাজার হাদীস আদ্যোপান্ত ধারাবাহিকভাবে শুনিতে দিলেন এবং উপস্থিত সকলে আপন আপন কপি সংশোধন করে নিলেন। তখন তার বয়স মাত্র ১৬ বছর।

১৬ বছর পর্যন্ত ইমাম বুখারী জন্মভূমি বুখারার মোহাদিসগণের কাছেই হাদীস শিক্ষা কবেন। ২১০ হিজরীতে স্নেহময়ী মাতা ও ভাই আহমদের সাথে বিদেশ পর্যটনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মক্কাবিমুখে রওয়ানা হন। মক্কা হজ্জ পালনের পর মা ও ভাই দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু ইমাম বুখারী হাদীস শাস্ত্রে আরো অধিক ব্যুৎপত্তি লাভের আকাংখায় পবিত্র মক্কা থেকে যান। মক্কার প্রতি যশা বড় বড় মুহাদিস গণের কাছে দুই বছর যাবৎ হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে যথাক্রমে মদিনা বসরা, কুফা ও বাগদাদে হাদীসের উচ্চ জ্ঞান লাভ করেন।

বুখারী, গণরায় এবং ব্যাতিমান

ইমাম বুখারীর হাদীসের উত্তরসূরী

মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ মুসনাদী, ইবরাহীম ইবনে আশ'আহ, মোহাম্মদ ইবনে সালাম বয়কানী, আব্দামা হমাইদী আবুল অলীদ, আহমদ ইবনে আরযাফ, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের প্রমুখ।

ইমাম বুখারীর বাগদাদ গমনের সাথে সাথে সমগ্র নগরীতে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। তৎকালীন খেলাফতে আব্বাসিয়ার রাজধানী বাগদাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সহ বড় বড় মোহাম্মদীয় একত্রিত হন এবং ইমাম বুখারীর সাথে তাঁরা পরীক্ষা মূলক আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ পর্যায়ে বাগদাদের খ্যাতি সম্পন্ন দশ জন মুহাম্মদিকে নির্বাচিত করা হয়। তাঁরা প্রত্যেকে দশটি করে হাদীসের সনদ ও মতন উলট পালট করে মোট একশত হাদীস ইমাম বুখারীর সামনে পেশ করেন। ইমাম বুখারী প্রত্যেকের প্রতিটি হাদীসের ভুল বর্ণনা ও পরে তাব সঠিক সনদ ও বিশুদ্ধ মতন এক এক করে ধারাবাহিকভাবে বিষয়কর পারদর্শিতার সাথে পেশ করেন। উল্লেখিত ঘটনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, খোদা প্রদত্ত স্মৃতিশক্তির অধিকারী ইমাম বুখারীকে আব্দুল্লাহ পাক ইলমে হাদীসের জন্যই সৃষ্টি করছিলেন।

হাদীস সংকলন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠিতে ইমাম বুখারী ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। তাঁর আখলাক-চরিত্র ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কোন রকমের সন্দেহ সৃষ্টি হতে পাবে এমন সব আচরণ থেকে তিনি সর্বদা সতর্ক ছিলেন। প্রয়োজনে যে কোন ধরনের পার্থিব স্বার্থ ত্যাগ করতেও তিনি মোটেই কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

ছাত্র জীবনের একটি বিষয়কর ঘটনা। একবার তিনি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা সংগে নিয়ে সমুদ্র পথে রওয়ানা হন। পথি মধ্যে সামুদ্রিক ঝড়ের কারণে ইমাম বুখারীর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং কথ্য প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর নিকট এক

হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আকার কথা জেনে ফেলে। এক সময় সেই ধৃত বন্ধুটি ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ সজোরে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে, আমার এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা চুরি হয়ে গেছে। জাহাজে তখন এক চাক্ষুষকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। শুরু হয় ব্যাপক তদ্বারী। ইমাম বুখারীর ধৃত বন্ধুর দুরভিসন্ধি বুঝতে ব্যক্তি রইল না। তিনি ভাবলেন, এই পরিস্থিতিতে তার সত্য কথায় কেউ কান দিবে না। বরং তার কাছে স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেলে তা' হবে তার বিশ্বস্ততার প্রতি এক দূরপন্থের কলংক। কিংকর্তব্য বিমূঢ় ইমাম বুখারী হাদীস শাস্ত্রের ইজ্জত রক্ষার খাতিরে মুদ্রার তোড়াটি সন্তপণে সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করেন।

এ ঘটনা হাদীসের প্রতি তাঁর স্বেচ্ছাভাব প্রেম ও পার্থিব সম্পদের মোহহীনতার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি সনদসহ ৬ লক্ষ হাদীস মুখস্ত জ্ঞানতেন। তদুপরি সহীহ, গায়ের সহীহ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য বিধান ও হাদীসের দোষ ত্রুটি যাচাইয়ের মত সুকঠিন কার্যেও প্রবল উৎসুক্য ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। হাদীস বর্ণনায় তাঁর সত্যতা, সাধুতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়নতা, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর কোন তুলনা হয় না।

হয়খানি হাদীস ভাষ্যের শ্রেষ্ঠতম হাদীস গ্রন্থ সহীহ আল বুখারী বিশ্ব বাসীর জন্য ইমাম বুখারীর এক অনুগ্রহ ও তুলনাহীন অবদান। সুদীর্ঘ ১৬ বছর অক্লান্ত সাধনা করে তিনি এ জগৎ বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। ছয় লক্ষ হাদীসকে

বিশুদ্ধতার কঠি পাথরে যাচাই করে ৯০৮২ টি হাদীস দ্বারা তিনি এ মহান গ্রন্থটি অলঙ্কৃত করেছেন। প্রতিটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করে নিতেন এবং দু'রাকাত সালাত আদায় করে হাদীসের বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ নিশ্চয়তা ও নির্মল মানবিক প্রশান্তির পরে এক একটি হাদীস লিখতেন। বুখারী শরীফ সংকলনের দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ তিনি ধারাবাহিকভাবে রোজা রেখেছিলেন। অসাধারণ সাধনা ও সীমাহীন অধ্যাবসায়ের বদৌলতে ইমাম বুখারী রসুলের প্রিয় আমানতকে পরম বিশ্বস্ততার সাথে সঞ্চার করে গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অভাবনীয় কল্যাণ সাধন করে গেছেন। তাই সমগ্র জগৎ চিরদিন তার এই অবদানের কথা পরম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছে ও করবে।

ইসলামী জগতে এই পুণ্যশীল ইমামুল মোহাম্মদীয় আবু আবদুল্লাহ আল বুখারী ২৫৬ হিজরীর পহেলা শাওয়াল ইদুল ফিতরের রাত্রিতে প্রায় ৬২ বছর বয়সে সমরকন্দ যাওয়ার পথে খরতংগ নামক স্থানে গোটা মুসলিম মিল্লাতকে শোক সাগরে ডাসিয়ে আপন প্রতিপালকের সান্নিধ্যে চলে যান।

সূর্য যতোদিন উদিত হবে এবং বিস্তুরিত হবে প্রভাতের আলো, শিশির রাতে নীল আকাশে ঝুলতে থাকবে সিতারার মালা, ততো দিন বিশ্ব মানব তোমায় স্মরণ রাখবে। হে ইমাম বুখারী! হে মুহাম্মদস্বর্ণের ইমাম।

তোমার উপর বর্ষিত হোক আব্দুল্লাহর অফুরন্ত রহমতের অঝোর ধারা।

আমার দেশের চালচিত্র

(১৩ পৃঃ পর)

জনগণের অর্থে লাগিত পালিত যে সরকার সেই সরকার যদি উন্মোক্ত জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে তবে তার প্রয়োজনীয়তা আদৌ অবশিষ্ট থাকে কি? সরকার এ প্রশ্নের যদি কোন সদুত্তর না দেন তবে ইসলাম প্রেমী জনগণকেই বুক ভরা ঈমান নিয়ে সরকারের মুখোমুখি দাড়িয়ে এর কৈফিয়ত নিতে হবে। কেননা গণতান্ত্রিক সরকার নাকি জনগণের

নিকট দায়ী, তাদেরকে নাকি সন্তুষ্ট করতে হয়।

কোথায়, কোন বলয়ে লুকিয়ে আছে মুসলমানেরা, আর দিবা-দুসু নয় তোমার পূর্বসূরীরাতো খলীফা উমর (রাঃ) এর মত মহামানবের সামনেও সাম্যের খাতিরে কৈফিয়ত নেয়ার জন্য দাড়িয়ে যেতেন, তোমরা তাদের পথই অনুসরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। নির্ভিক চিত্তে জোর কদমে এগিয়ে আসো আর দেবী নয়।

ক্ষমা নেই মোহাম্মদ আলী

পুশিত এই সৌধের কাছে কোন হায়েনার দল,
হিংস্রতায় ক্ষত-বিক্ষত কেন ঐ পবিত্র মূল।
ক্রান্ত দুপুরে ব্যস্ত গ্রহের কানের হাতুড়ী দিয়ে
জড়বাদীদের কালো হাতের ইংগিতে
আঘাত করল পবিত্র মসজিদের গায়,
ভেসে ভেসে ধুলায় লুটিয়ে দিল হায়।
কেন ছিলাম সেখানে অস্থায়ী গ্রহরীরা?
বুপেট-বোমাসহ কেন তারা পালিয়ে গেল?
পশু কপ্যাণের অকল্যাণী কারখানা
বস্ত্র আর লাশ কৃষ্ণসহ সকলে মিলে
একই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলো,
মসজিদ ভাঙতে হবে, এখানেই কালনিক রামের জন্ম।
তোদের নিস্তার নেই, তোদের চারদিক অন্ধকার
সবখানে লাগছে আগুন,
বিশ জুড়ে আজ উঠেছে তুফান
বেড় কর খুঁজে জড়বাদীদের
কোথায় লুকিয়েছে তারা।
দু'চোখে অন্ধকার দেখে হয়েছে বেহুশ
তাইতো তারা করেছে চিংকার
মরণের কালে ফেরাউনের মত বপছে,
আমরা করেছি মহাভুল।
এ ওদের হৃদের কথা নয়,
ওরে তোদের ক্ষমা নেই।
ওদের ক্ষমা করবে না কোন মুসলমান।

পরিচয় আবদুস সামাদ চৌধুরী

মুসলিম তারই নাম
যে করে বিশ্ব প্রভুর জন্য সংযত সংগ্রাম।
নিজেকে চিনেছে সত্যিকারেই আশ্রায় ঝাঁদি দাস
সহনশীলতা অর্জন করে কাটায় সে কাল-মাস।
নিজে ত্যাগী হয়ে সত্যের দাবী মিটায় সে বারবার
জ্বালামে জ্বলুম প্রতিরোধ করে থাকেনা নির্বিকার।
অশান্তি আর অরাজগততার শিকার হয় না কভু
এক আত্মাকে সিদ্ধা ছাড়া জানে না অন্য প্রভু।
মুসলিম সেই হয়
আত্মাহুত রাসূল-তরিকা সাথে রাখে সদা পরিচয়।
নিজে সংহয়ে সঠিক পথের করে সম্মান।
চলার পথের প্রতিবন্ধক সব ভেঙ্গে করে খান খান।
মিথ্যার সাথে পরাজয় সেত অবিশ্বাসীই জানে
সুযোগমত সত্য মিথ্যা উভয় তাহারা মানে।
বিশ্বাসী হয় সর্বকালেই সত্যের উপাসক
সত্য ছাড়া সকল কর্ম জানে সে নিরর্থক।
এই কি মুসলমান
সারা বিশ্বের প্রলেভন যারে করে থাকে হতমান।
মুসলিম সেতো নির্লোভ হবে, পার্থিব বাসনা থাকবে না তার
ওয়াদা প্রভুর বিশ্বাস করি গতি হবে দুর্বীর।
প্রলুব্ধ কভু হবে নাক দীল জানে সে মুসলমান
গোটা দুনিয়ার রাজত্ব তার খোদায়ী সে ফরমান।
এত বড় কাজ পেয়ে সে কি কভু হতে পারে প্রমদক
হয় যদি তবে মুসলিম নাম হবে যে নিরর্থক।

সুসংবাদ!

সুসংবাদ!!

সুসংবাদ!!!

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) এর পক্ষ হতে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে বেফাকের প্রাইমারীর সকল বিষয়ের বই পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এবং শীঘ্রই কওমী পাবলিকেশন্স এর মাধ্যমে উহা প্রকাশ ও বাজারজাত করা হচ্ছে-ইনশাআল্লাহ।

অতএব সকল মওমী মাদ্রাসায় অত্র বই পুস্তক সমূহ পাঠ্য করার জন্য এবং অন্যান্য বই পাঠ্য না করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(মাওলানা) আবদুল জব্বার

সাধারণ সম্পাদক

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া

বাংলাদেশ।

বিঃদ্রঃ সার্বিক যোগাযোগঃ কওমী পাবলিকেশন্স
১৫৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০



○ আঃ রহমান,
চাঁদখালী,
পাইকগাছা, খুলনা।

প্রশ্নঃ যে, বন্ধুর সাথে সাফাতের সময় সালাম দিলাম তার থেকে বিদায়ের বেলা তাকে সালাম দেয়া জাযিয় কি?

উত্তরঃ নাজায়েয তো নয়ই বরং বিদায়ের সময় সালাম দেয়ায়ও সূরাত। হাদীস প্রমাণ করে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায়ের সময়ও সালাম দিয়ে বিদায় নিতেন। আপনি যার সাথে সালাম দিয়ে সাফাৎ করলেন, কথা বললেন, বিদায়ের বেলায় গোমরা মুখে মুখ বুজে বিদায় নিলে সে স্বাভাবিকভাবে ভাবতে পারে, হয়তো তাঁর কোন আচরণে ও কথায় আপনি কষ্ট পেয়েছেন, অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বাস্তবে এমন কিছু না ঘটলেও এই চিন্তা তার মানসিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। যতি আপনি সালাম দিয়ে হাত মিলিয়ে হাসি মুখে বিদায় নেন তবে আপনি যে তাঁর আচরণে কষ্ট পাননি বা অসন্তুষ্ট নন এ কথা সে সহজে বুঝতে পারবে এবং যা তার মানসিক প্রশান্তিতে সহায়ক হবে। তাই বিদায় বেলা সালাম দেয়া নৈতিক দায়িত্বও বটে।

○ মোঃ আঃ কাইয়ুম,
ঝনঝনিয়া-বাশবাড়িয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা,
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

প্রশ্নঃ (ক) জামার হাতা কনুইর ওপরে জড়ানো অবস্থায় নামায আদায় করা জাযিয় কি?

(খ) নামাযের নিয়ত করার সময় আরবা রাকাতি, ছালাছা রাকাতি যেমন বলতে হয় 'অনরূপভাবে দু'রাকাতের বেলায় 'রাকাতাই' শব্দটি উল্লেখ করা জরুরী কি?

(গ) এমন রোগ হয়েছে যার থেকে মুক্তির জন্য ডাক্তার ধুমপান করার পরামর্শ দিলে তখন ধুমপান করা জাযিয় হবে কি?

উত্তরঃ (ক) জামার হাতা কনুইর ওপরে জড়ানো অবস্থায় নামায আদায় করা না জাযিয় নয়। তবে নামাযের আদবের খেলাপ। ইচ্ছাকৃত এমন করা অবশ্যই দৃষ্টিকটু কাজ। নামাযের সময় খুটি নাটি সব ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই। নামাযের ছোট একটি আদবকেও ইচ্ছাকৃত বর্জন করা ঠিক নয়। মনে রাখা চাই, ঈমানের পরে নামাযই সর্বাপেক্ষা পূণ্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত।

(খ) নামাযের জন্য নিয়ত ফরয এবং শর্ত বটে তবে (প্রচলিত নিয়মে) দু', তিন ও চার রাকাতের কথা উল্লেখ করা জরুরী নয়। যারা আরবী ভাষার অর্থ বুঝেনা তাদের জন্য বাংলায় নিয়ত করাই উত্তম। নিয়ত মানে ইচ্ছা করা, তাই যে পর্যায়ের যে কয় রাকাত নামায আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে দাড়িয়েছেন এটাই আসল নিয়ত। এর পরে তা মুখে উল্লেখ না করলেও হয়। ইচ্ছাই আসল নিয়ত। ধরুন, জোহরের নামায শুনে মসজিদের দিকে রওয়ানা দিয়েছেন জামাতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে। আপনি অবশ্যই জানেন যে, জোহরের ফরয চার রাকাত। তাই জামাতের সাথে কাতারে দাড়িয়ে জোহরের চার রাকাত ফরয নামায আদায়ের কথা নতুনভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। কেননা আপনি মসজিদে গিয়েছেনই এই উদ্দেশ্যে। এটাই আসল নিয়ত।

(গ) সাধারণত ধুমপান করা মাকরুহ এবং কোন কোন পর্যায়ে হারাম। ধুমপান দ্বারা যদি আপনি বিড়ি, সিগারেট বা হুকা সেবন বুঝেনও বুঝিয়ে থাকেন তবে মনে রাখতে হবে, এসব তৈরী করা হয় তামাক দ্বারা। আর তামাক হারাম বস্তু নয়। ধুমপান করা যখন নেশার পর্যায়ে পৌঁছে এবং যখন ধুমপানের দুর্গন্ধ অন্যের কষ্টের কারণ হয় তখনই কেবল তা হারাম হয়। এছাড়া ধুমপান সর্বাবস্থায় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তবে এমন কোন রোগের কথা আমাদের জানা নেই যার একমাত্র প্রতিষেধক ধুমপান। এর বিকল্প কোন ঔষধ অবশ্য আছে যা আপনার ডাক্তার সাহেবের জানা নেই। ধুমপান না করানোর জন্য যদি রোগী মারা যাওয়ার উপক্রম হয় এবং এ-ই এর একমাত্র প্রতিষেধক হয় তবে সেকথা আলাদা। এব্যাপারে অভিজ্ঞ কোন মুফতী এবং মুমিন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর সাথে পরামর্শকরে নিলে ভালো হয়। কেননা, ঈমান ও আমলের প্রশ্নে সাফল্য সংশয় থেকে বেঁচে থাকা চাই।

○ মোঃ হাসান আলী,
খাজুরা বাজার,
যশোর।

প্রশ্নঃ গ্রামের লোকেরা মনে করে, নওশাসহ মাত্র তিনজন লোক বরযাত্রী হওয়া অশুভ এবং অমংগলজনক। আসলেই কি তাই?

উত্তরঃ আসলে তা নয়। এটা একটা কুসংস্কার, ইসলামে এর কোন অস্তিত্ব নেই। এসব হিন্দু সমাজের রোহম যা অতি ধীরে কালক্রমে হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করার কারণে আমাদের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করেছে। কুরআন ও হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। দিন-ক্ষণের বেলায় শুভ অশুভ বলে ইসলামে কোন বিধান নেই। আমাদের দেখতে হবে, আমাদের সব কাজ সূরাত মুতাবেক হচ্ছে কি না। কেননা যা সূরাত তাই আমাদের জীবনচাচরের মূল উপাদান। ব্যবহারিক জীবনে সূরাতের অনুসরণ করার জন্যই পরিচয়ে আমরা মুসলমান।

❖ মোঃ মিজানুর রহমান,
সেনহাটি যাকারিয়া মাদ্রাসা,
দিঘলিয়া, খুলনা।

প্রশ্নঃ (ক) ওরশ শব্দের অর্থ কি এবং 'ওরশ' নামের অনুষ্ঠান করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জাযিয় কি?

(খ) আত্মাহু পাক আদম (আঃ)কে আরবী ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আমরা তাঁরই সন্তান হয়ে বাংলাভাষায় কথা বলি কেন এবং কিতাবে ভাষার মধ্যে বিভিন্নতা ও পার্থক্যের সৃষ্টি হয়?

উত্তরঃ (ক) ওরশ একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বিবাহ-উৎসব, বর-কনের বাসর যাপন ইত্যাদি। ওরশ শব্দটি সব সময় বিবাহ সম্পর্কিত উৎসব অর্থে ব্যবহৃত হয়। ওরশ দ্বারা যে কোন ধরনের উৎসবকে বুঝায় না। তাই আরবীতে নতুন বরকে 'আরীস' এবং নব-বধূকে 'আরীসা' বলা হয়। আমাদের এই উপমহাদেশে ওরশ অর্থে প্রচলিত যে অনুষ্ঠানকে বাঝায় তা আরবী অভিধান ও সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই অনুষ্ঠানটি অবশ্যই আমাদের নিকটবর্তী যুগে কোন অনারব ব্যক্তি আবিষ্কার করেছেন। শরীয়াতের কিতাবে এবং ইসলামের প্রথম থেকে এক হাজার বছরের ইতিহাসে এর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমানে ওরশের নামে যা হচ্ছে তা আত্মাহুর রাসূল, সাহাবীগণ ও তাঁদের পরবর্তী ইমামগণের কবরকে কেন্দ্র করে অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান এখনও কোথাও হয় না এবং অতীতেও হতো না।

প্রচলিত 'ওরশ' একটি তথাকথিত অনুষ্ঠানের রূপ নিয়ে কবে থেকে শুরু হয়েছে এর নির্ভরযোগ্য-সঠিক তথ্যের কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। কোন বুযুর্গ তাঁর কবরকে কেন্দ্র করে ওরশ জাতীয় কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করার আদেশ দেওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যে কয়টি কথা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে উম্মতকে বলে গেছেন তা ছিল, "কোন অবস্থাতেই তাঁর কবরকে যেন এবাদতের স্থানে পরিণত করা না হয়।" তিনি আরও বলেছেন, "ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা নবীগণের কবরকে এবাদতগাহে পরিণত করে আত্মাহু তা'আলার অতিশাপ গ্রস্ত হয়েছে।"

ওরশ নামক যে অনুষ্ঠানটি আমাদের দেশে 'পবিত্র' 'মহাপবিত্র' বলে গুলন করা হয়, তা আসলে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। এসব এক শ্রেণীর বাটপার ধরনের কুমতলবী লোকের এদেশের সরল মানুষের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগে তাদের গাটের পয়সা হাত করার কপাল। 'ওরশ' এখন সৃষ্টিগত বাণিজ্যিক ব্যাপার সাধারণ সুতরাং এসব অনুষ্ঠানে শরীয়াত গর্হিত কোন ক্রিয়া কর্ম হওয়ায় আশাযাচিত হওয়ার কিছু নেই। কোন অবস্থায় একে ইসলামী

অনুষ্ঠান বলার যৌক্তিকতা নেই। ওরশের নামে যা হচ্ছে তার প্রায় সর্বাংশ শরীয়াত গর্হিত কাজ।

(খ) আত্মাহু পাক যে আদম (আঃ)-কে আরবী ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন বা তিনি যে আরবী ভাষায়ই কথা বলতেন এর সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। অনুমান করে বলা হয় যে, তিনি যেহেতু জান্নাত থেকে সরাসরি পৃথিবীতে আগমন করেন, আর জান্নাতের ভাষা আরবী হওয়া হেতু তাঁর ভাষা আরবী হওয়াই স্বাভাবিক। তবে একথার পক্ষে প্রমাণ্য দলীলের খুবই অভাব। আর ভাষা সৃষ্টির ইতিহাসেরও ওই একই অবস্থা। মাত্র কয়েকটা ভাষাবাদে সবভাষায় মানুষ শতাব্দী শতাব্দী পূর্ব থেকে কথা বলে আসছে। সে সময়ের কোন মানুষের হাতে নেই। কবে থেকে ভাষা লিখিত রূপ নেয় এর ইতিহাসও অনেকাংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর কোন কোন ভাষায় কবে থেকে মানুষ কথা বলে আসছে এর ইতিহাস আবিষ্কার করা তো গবেষণারও উল্লের ব্যাপার। তবে প্রধান প্রধান ভাষাসহ সব ভাষার মধ্যে আরবীর একটা দখল লক্ষ্য করা যায়। এই সূত্র ধরে অনুমান করা হয় যে, আরবীই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। ভাষা সৃষ্টির রহস্য আত্মাহুর একটি অপার কুদরত। ভাষার বিভিন্নতা যে পারস্পরিক পরিচয়ের সুবিধায় করা হয়েছে তা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত বিষয়।

❖ হাফেজ মোঃ নুরুল আমিন (যশোরী),
বাশবাড়িয়া মাদ্রাসা,
টুঙ্গিপাড়া,
গোপালগঞ্জ।

প্রশ্নঃ শহীদ হাফেজ মোঃ নুরুল করীমের জীবনী জানতে চাই।

উত্তরঃ ডিসেম্বর ১৯৯২-সংখ্যার প্রশ্নোত্তর দেখুন।

❖ মোঃ যাকারিয়া,
সেনহাটি যাকারিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা,
দিঘলিয়া, খুলনা।

প্রশ্নঃ আমরা বিশ্বাস করি, আত্মাহু একজন, আমাদের আসমানী গ্রন্থ একখানা এবং রাসূলও একজন। মোট কথা এক কণেমায় আমরা বিশ্বাসী। আত্মাহুর কুরআন ও রাসূল (সাঃ) যা বলেছেন তাই আমাদের মান্য। তবে এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্য মতভেদ কেন? একই বিষয়ের ব্যাপারে কারও অতিমত হালাল কারও অতিমত হারাম এমন কেন? সত্য তো একটি, তাহলে কার কথা আমরা মানব?

উত্তরঃ ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই এবং দ্বিমতের অবকাশও নেই। কেননা তা কুরআনের আয়াত ও মযবূত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইমামগণ কেবল সেই দল যা অন্যের ইচ্ছা-নিষেধ করে সেসব দল যা কুরআন ও হাদীসের অস্পষ্টতা বিরাজমান। আশা করি নিম্নোক্ত ঘটনাটি দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে:

একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদল সাহাবীকে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট একটি স্থানের কথা উল্লেখ করে বলে দেন, তোমরা সবাই অমুক স্থানে গিয়ে আসরের নামায আদায় করবে। সেখানে তাদেরকে পৌছতে পৌছতে আসরের নামাযের সময় শেষ হয়ে যাবে দেখে সাহাবী দলের একাংশ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অমুক স্থানে পৌছার পর আসরের নামায আদায় করতে বলেছেন, নামায কাজা হলেও সেখানে পৌছেই তা আদায় করতে হবে। এই বলে তারা নির্দিষ্টস্থানে না পৌছার পূর্বে নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকেন। দ্বিতীয়াংশ বলেন, হযরত (সাঃ) এর একথা বলার উদ্দেশ্য ছিলো, তিনি ধারণা করেছিলেন, আসরের সময় থাকতে আমরা সেখানে পৌছে যাব। এখন যেহেতু সেখানে পৌছার পূর্বে সূর্য ডুবে যাবে তাই ওয়াস্ত থাকতে এখানে নামায আদায় করাই উচিত হবে। কোন অবস্থায়ই নামায কাজা করা ঠিক নয়। এই বলে তারা সেখানেই নামায আদায় করে নেন।

এই ঘটনা রাসূল (সাঃ) জানার পর তিনি উভয় দলের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। উভয় দল রাসূল (সাঃ)-এর কথার ওপর ভিত্তি করে ইজতেহাদ করেন। এখানেও জামে' না জামে'য়ের বিষয়টি লক্ষণীয়। এভাবে ইমাম মুজতাহিদগণ শরীয়াতের অস্পষ্ট ও এক বিষয়ে একাধিক বক্তব্যমূলক ব্যাপারে আলোচনা পর্যালোচনার পব প্রাপ্ত নিজ নিজ নির্ভরযোগ্য দলীলের ওপর ভিত্তি করে একটা সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করেছেন মাত্র। সকলেরই লক্ষ্য সত্য আবিষ্কার—সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ পর্যায়ে সকল মাযহাবের সিদ্ধান্ত যে সঠিক উপরোক্ত ঘটনাটিই তার প্রমাণ। কেননা কোন ইমামই মনগড়া দলীল দ্বারা মাসআলা উদ্ভাবন করেননি। সকলেই কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে কথা বলেছেন, সিদ্ধান্তে পৌছেছেন।

আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থার কথাই ধরুন। এই বিচার ব্যবস্থার অধীন আদালত গুলোকে কোন কোন মুকাদ্দামার বেলায় ভিন্ন ভিন্ন রায় দিয়ে দেখা যায়। সব বিচারকই কিন্তু আইনের ধারা ও নীতিমালার আলোকে ফয়সালা দেন। এক বিচারক আসামীকে নিরপরাধ বলেন অন্য বিচারক অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেন। একই মুকাদ্দামার আসামীকে কেউ মৃত্যুদণ্ড দেন কেউ যাবৎজীবন কারাদণ্ড দেন, কেহ খালাস দিয়ে দেন।

এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন। একই বিচার ব্যবস্থায়, একই মুকাদ্দামায় এক একজন বিচারকের রায় এক এক রকম কেন? একে কি আপনি বিচার ব্যবস্থার জটিলতা বা ব্যর্থতা বলবেন?

না এসব বিচার ব্যবস্থার জটিলতাও নয় ব্যর্থতাও নয়—বিচার ব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক এবং প্রত্যেকের ফয়সালাই সঠিক কেননা তারা আইনের আলোকে বিচার করেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হলো, বিচারের রায়ের বিপরীত হলেও, তেমনি মাযহাবী মাসআলার

ক্ষেত্রে নিজ নিজ মাযহাবে শ্রেষ্ঠ চার ইমামের সর্বসম্মত রায়ই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচ্য। প্রত্যেক ইমামের রায় যে সত্য ও সঠিক তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিষয়টি আরও বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। সীমিত পরিসরে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো কেবল সংশয় অপনোদনের জন্য।

❖ মুহাম্মাদ ওহমান,
এমদাদুল-উলুম মাদ্রাসা,
ধর্মপুর, ফটিকছড়ী,
চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ (ক) দস্তার খানার পরিবর্তে কাগজ বা পেপার দস্তার খানা রূপে ব্যবহার করা জাযিয় কি?

(খ) যে জায়নামাযের ওপর মক্কা মদীনার ছবি অংকিত থাকে তার ওপর দাড়িয়ে ইমাম সাহেবের নাময পড়া জাযিয় হবে কি?

উত্তরঃ (ক) এটা জাযিয় না জাযিযের বিষয় নয়। এটা আদব গায়রে আদবের ব্যাপার। দস্তারখানা এক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় এবং কাগজ ব্যবহার করা হয় অন্য উদ্দেশ্যে। নিজ নিজ স্থানে কোনটির গুরুত্ব কম নয়। তাই দস্তারখানাকে যেমন কাগজরূপে ব্যবহার করা হয় না তেমনি কাগজকেও দস্তারখানা বানানো ঠিক নয়। যে উদ্দেশ্যে দস্তারখানা ব্যবহার করা হয় কোন কাগজ দ্বারা যদি সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয় তবে সূরাত আদায় হয়ে যাবে বটে। তবে কোন কাগজকে দস্তারখানারূপে ব্যবহার করা যে ঠিক নয় তা নির্দিষ্টায় বলা যায়। কেননা, ইসলামের সাথে কাগজের সম্পর্ক সুগভীর। তাই কাগজের মর্যাদা অপরিমিত। যা সভ্যতারও অংশ।

বর্তমানে কাগজের বহুল ও বহু প্রকার ব্যবহারের কারণে সর্বক্ষেত্রে এর মর্যাদা বিচার করে চলা সম্ভব নয়। যেমন ধরুন 'টয়লেট পেপার' বা সম্পূর্ণরূপে কাগজের উপাদান দিয়ে তৈরী। তবে কাগজের উপাদানে এর তৈরী হলেও যেহেতু এর তৈরীর উদ্দেশ্য ভিন্ন। সেহেতু আলিম-বুয়ুগ, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সকলে নির্দিষ্ট টয়লেট পেপার ব্যবহার করেন। অনুরূপভাবে কাগজের উপাদান দিয়ে যদি কোন দস্তারখানা তৈরী করা হয় তবে তা ব্যবহারও নির্দোষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিশেষে কাগজকে দস্তারখানারূপে ব্যবহার করা জাযিয় হলেও নির্দোষ নয়।—অবশ্যই আদবের খেলাফ। এর দ্বারা একদিকে যেমন সূরাত হিসেবে দস্তারখানার গুরুত্ব হ্রাস পায় অপরদিকে কাগজেরও অমর্যাদা হয়।

(খ) এজন্যই যে কোন সম্মানীত স্থান ও জিনিসের ছবি তোলা অনুচিত। মানুষ সকল প্রাণীর মধ্যে সম্মানীত হওয়ার কারণে তার ছবি তোলা না জাযিয় হওয়ার বহু কারণের এটিও একটি। মনে হয়, এক শ্রেণীর লোক অত্যন্ত সূক্ষ্ম চক্রান্তের মাধ্যমে মুসলিম হৃদয় থেকে বিতর্কিত মাদানার সম্মান, নীতি, ইত্যাদি দূর করে, এসব মাযহাবী ও মসজিদবর্ষীর সম্মান রক্ষার্থে এসব জায়নামায ব্যবহার করা

থেকে বিরত থাকা উচিত। মসজিদ অপ্রাণী হওয়ার কারণে তার ছবি তোলা যায়। তাই বলে কোন অবস্থায় এর অসম্মান করা যায় না। যে সব জায়নামাযে এই সব পবিত্রস্থানের ছবি দেখা যায় তা ত্রুণ করা থেকে বিরত থাকা চাই। তবে যেহেতু কোন ইমাম বা নামাযী ব্যক্তিই বাইতুন্নাহ ও মসজিদুরববীর অসম্মান করণার্থে এর ওপর বসেন না বা দাড়ান না তাই এর ওপর বসা না জাযিয হবে না। তাছাড়া জায়নামাযের ওপর অংকিত ছবি মসজিদ ও মদীনা শরীফের সেকলে হলেও আসলে তাই কিনা তাও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার।

○ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
গ্রামঃ ফুলবাড়ী,
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

প্রশ্নঃ (ক) নারী হরণ ইসলামে নিষিদ্ধ এবং কঠিন পাপ। কিন্তু আজ সমাজের কোন কোন লোক নারী হরণের পর তা প্রেম অভিসারে রূপান্তরিত করে হরণের হয়রাণী থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এভাবে তারা নারী হরণ করে সমাজ থেকে বহু দূরে কোথাও নিয়ে হরণকৃত নারীর সাথে একত্রবাস করে। এসব শরীয়াতের দৃষ্টিতে বৈধ কি?

(খ) কোর্ট ম্যারেজ বৈধ কি?

উত্তরঃ (ক) শরীয়াতের দৃষ্টিতে নারীসহ যে কোন লোকে হরণ করা কঠিন ও কঠোর অপরাধ। আমাদের দেশের প্রচলিত আইনেও এর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা। ইসলামে বয়স্ক নারীকে হরণ করা জেনা করার সমান। অতএব এর শাস্তি কত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিবাহের পূর্বে গায়রে মোহরিম নারী পুরুষের একত্রবাস কোন অবস্থায় বৈধ নয়। তাদের প্রতিটি মিল মানে এক একটি ব্যাভিচার। এই মিলনের ফলে সন্তান জন্মিলে তা হবে জারজ সন্তান।

(খ) নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষীর সামনে বয়প্রাপ্ত পুরুষ এবং বয়প্রাপ্তা নারী একে অপরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নেয়ার সম্মতি প্রকাশ করলে বিবাহ বৈধ বলে বিবেচনা করা হয়। কোর্ট ম্যারেজের অনুষ্ঠানে এই ব্যবস্থাটুকু থাকলে বিবাহ বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে কোন রকমের সন্দেহের অবকাশ নেই।

○ মুহঃ মিজানুর রহমান,
জামেয়া রহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মাদ্রাসা,
ঢাকা-১২০৭।

প্রশ্নঃ ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে কি ঘটেছিল এবং এই ৭ই নভেম্বরকে জাতীয় সংহতি দিবস বলি।

উত্তরঃ ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এক প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে সেনাবাহিনীর প্রধান ঘোষণা করেন। এ সময় জেনারেল জিয়াকে ক্যান্টনমেন্টে ও প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমেদকে বঙ্গ ভবনে গৃহবন্দী করে রাখেন। ৩রা নভেম্বর থেকে ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত জাতি চরম অনিশ্চয়তা ও গভীর দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে কাটায়। এ সময়টা বৈদেশিক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কাল হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ৫ই নভেম্বর খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রধান চারপাতি আবু সাদত মোঃ সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে হীন চক্রান্তের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াস পান। ৬ নভেম্বর বিচারপতি সায়েম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। দেশটির ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় সেনাবাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ ও জনতার মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দানা বেধে ওঠে। দেশের বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে কয়েক ডিগ্রি সৈন্য ঢাকায় চলে আসে। বিক্ষুব্ধ সেনারা বন্ধীদশা থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করে আনে। জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, বিডিয়র, পুলিশ, আনসার ও জনগণের একটি স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ঘটে ৭ই নভেম্বর। সিপাহী জনতার এই মিলিত প্রতিরোধের মুখে খালেদ মোশাররফের বিদ্রোহী দলটি পরাজিত হয়। খালেদ মোশাররফ জনতার রোষাণলে পড়ে নিহত হন। ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতা মিলিত ভাবে বিপ্লব সাধন করেছিল বলে এই দিনকে জাতীয় সংহতি দিবস বলা হয়।

ভুল সংশোধন

গত জানুয়ারী ১৯৯৩ সংখ্যায় গ্রন্থান্তর বিভাগে জুলাফিকার আহমাদ এর এক প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হয়েছে যে, "যেমন খৃষ্ট ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে হযরত ইসা (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরে।" এখানে 'ইন্তেকালের' স্থলে 'উদ্ধাগমন' পড়তে হবে। এই অনিশ্চাকৃত ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

—নির্বাহী সম্পাদক

বিশেষ চিঠি

আসসালামু আলাইকুম

প্রিয় নবীন বন্ধুরা! সালাম ও শুভেচ্ছা নিবে। এ পর্যন্ত যারা কুপন পূরণ করে পাঠিয়েছে তাদের সকলের কুপন গ্রহণ করা হলো। যারা টিকেট পাঠাওনি, যারা ছাপান কুপন ছাড়া হাতে লিখে ঠিকানা পাঠিয়েছে এবং যারা স্বাক্ষর করনি তাদেরকেও সদস্য করে নেয়া হয়েছে। এটা তোমাদের জন্য ছোট্ট একটা সুসংবাদ নয় কি? আগামীতে যারা কুপন পাঠাবে তারা লক্ষ্য রাখবে:

- * কুপনের সাথে অব্যবহৃত দু'টাকার ডাক টিকেট অবশ্যই যেন থাকে।
- * কুপনের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে স্বহস্তে স্বাক্ষর করবে।
- * কুপনের নিচে পেখা কথাগুলো তুমি মানতে পারবে কিনা তা আগে ভেবে দেখবে।

হাজার হাজার সদস্য আমরা চাই না, চাই সচ্ছবনাময় কিছু উদ্যমী নবীন। তোমাদের সকলের নিজ নিজ শ্রেণীতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া আমাদের কাম্য। তুমি কি অদূর ভবিষ্যতে এই ভূখণ্ডে ইসলামের বিজয় ঘটাতে প্রথম সারীর মুজাহিদ হতে চাও? তাহলেই কেবল সাহিত্য সেবার ওয়াদাসহ নবীনদের কাফেলায় শরীক হও। আল্লাহ আমাদের সকলকে শাহাদাত নসীব করুন।

মাআসসালাম
পরিচালক ভাইয়া

বলতে পারো?

- ১। কত হিজরীতে রোজা ফরজ হয়?
- ২। রোজা ফরজ হওয়া প্রমাণ করে কুরআনের এমন একটি আয়াতের নাযারসহ সূরা উল্লেখ করে অর্থ লিখ।
- ৩। হযরত ওমর (রাঃ) কত হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন?
- ৪। বাবরী মসজিদটি কত সনে কার স্বরণে কে নির্মাণ করেন?
- ৫। "আজকে ওমর পৃথ্বী পথীক দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দিবে যারা প্রান্তর প্রাণ পণ,
উষর মাঠের অনাবাদি মাঠে কপালে কলস যারা
দিক দিগন্তে তাদের খুজিয়া ফিরিছে সর্বহারা।"
এই পংক্তি কয়টির রচয়িতা কে?

সঠিক উত্তর

- ১। একদা তাঁর জামার আঙ্গিনের মধ্যে একটি বিড়াল ছানা দেখে রাসূল (সাঃ) কৌতুকোচ্ছলে তাঁকে (বিড়ালের পিতা) আবু হরায়রা নামে সরোধন করার পর থেকে তিনি সকলের নিকট এই নামে প্রসিদ্ধতা লাভ করেন।
- ২। ইয়াছরিব।
- ৩। ১১৮৭ সনে।
- ৪। ১৩৮৯ সনের ১৫ই জুন তুর্কী সুলতান বায়েজিদ।
- ৫। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (রাঃ)

বিঃ দ্রঃ কারও উত্তর সম্পূর্ণ সঠিক না হওয়ায় কাউকে পুরস্কৃত করা গেল না।

তোমরা সবাই নবীন মুজাহিদ

- ৭৬। কে, এম, এবাদুল হক (তুহিন)
পিতাঃ খান মোঃ আঃ হাকীম
খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা,
খান জাহান আলী রোড, খুলনা।
- ৭৭। মোঃ আব্দুল আহাদ,
পিতাঃ মরহুম আব্দুল মজিদ মাস্টার,
গ্রামঃ বাসুদেবপুর,
পোঃ দেওলাবাড়ি,
থানাঃ মেলাসই, জেলাঃ জামালপুর।
- ৭৮। এস, এম, শামছ-উল-হুদা,
পিতাঃ সৈয়দ মোঃ আজিজুল হক,
ভাটিখাগড়া, মিঠামন,
কিশোরগঞ্জ।
- ৭৯। মোঃ গোলাম কাদির,
পিতাঃ সেলায়মান মিয়া,
গ্রামঃ দৌলতপুর পূর্বপাড়া,
পোঃ কাদিরগঞ্জ,
থানাঃ বানিয়া চং, হবিগঞ্জ।
- ৮০। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ,
পিতাঃ অধ্যাপক আলী সাকবর মোল্লা,
গ্রামঃ দুর্গাপুর,
পোঃ গিলাতলা,
থানাঃ রামপাল, বাগেরহাট।
- ৮১। মীর মোঃ অলী উজ্জামান,
পিতাঃ আব্দুস শহীদ মীর,
গ্রামঃ শাহাপুর, পোঃ হিলরচিয়া,
থানাঃ নিকলী, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।
- ৮২। মোঃ আব্দুল্লাহ আল আব্দুননূর,
পিতাঃ মোঃ মোঃ আব্দুল হামিদ,
রাইতলা, কসবা, বি, বাড়িয়া।
- ৮৩। মশহুদা আক্তার মল্লী,
পিতাঃ মাওঃ আবদুল খায়ের,
গ্রামঃ ব্রাহ্মহাটা,
পোঃ ব্রাহ্মহাটা বাজার,
নবীনগর, বি, বাড়িয়া।
- ৮৪। মোছাঃ সাদিনা সুলতানা,
পিতাঃ মাওঃ আবু সাঈদ
মোঃ ইসমাইল,
কুতুব খান্নো রসিদিয়া,
৫৫/২ চকবাজার,
ঢাকা-১১০০।
- ৮৫। মোঃ শরিফুল ইসলাম (শরিফ),
পিতাঃ ডাঃ সামসুর বহমান,
আশরাফুল উলুম (বেয়ক) মাদ্রাসা,
পিপলস টুট মিলস,
খালিশপুর, খুলনা।
- ৮৬। হাফেজ মোঃ আমিনুল হক ভূঞা,
পিতাঃ হাজী মোঃ খেলু ভূঞা,
কুচার মহল হাফেজী মাদ্রাসা,
শাহবন্দর, মৌলভীবাজার-৩২০০।
- ৮৭। মোঃ কাজী আমানুল্লাহ,
পিতাঃ কাজী আবু বকর,
গ্রামঃ ডুমুরিয়া, পোঃ সাজিয়াড়া,
থানাঃ ডুমুরিয়া, খুলনা।
- ৮৮। মোঃ আব্দুল গফুর হুসাইনী আলহানফী,
পিতাঃ মোঃ হোসাইন,
সাংঃ আমতলী ভালুকিয়া পালং,
পোঃ চাকবৈঠা বাজার,
থানাঃ উখিয়া, কক্সবাজার।
- ৮৯। মোঃ তাইমুর রহমান (মৃদুল),
পিতাঃ প্রভাষক মোঃ জৌফিকুর
রহমান,
সরকারী আখিযুল হক বিশ্ববিদ্যালয়
কলেজ, বগুড়া।
- ৯০। মুসাখাৎ নাসিমা আক্তার (ডুয়া),
পিতাঃ মোল্লা মুহাঃ নওশের আলী,
গ্রামঃ সুকতাইল, পোঃ সুকতাইল,
জেলাঃ গোপালগঞ্জ।
- ৯১। হোছাইন আহমাদ,
মাওঃ এম, এ কালাম (আজাদ)
গ্রামঃ দক্ষিণ মাদারী,
পোঃ নুরালী বাড়ী,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
- ৯২। মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন,
পিতাঃ অনিসুর বহমান,
গ্রামঃ মঠবাড়ী,
পোঃ সিরোলা, আশাশুনী, সাতক্ষীরা।
- ৯৩। মুহাম্মাৎ ইয়াসমিন (মিনি)
পিতাঃ মুহাম্মাদ মোসলেম,
সাংঃ শাহাবাজপুর, পোঃ সাতমাইল,
থানাঃ কোতওয়ালী,
বশোহর।
- ৯৪। জাফর আহমদ,
পিতাঃ মরহুম মোঃ মোহাম্মদ আলী,
অটিকড়িয়া দারুল উলুম কওমিয়া
হাফেজিয়া মাদ্রাসা,
পোঃ বাসুয়াহাট, সোনাতলা, বগুড়া।
- ৯৫। সৈয়দ হাফিজুর বহমান,
পিতাঃ মরহুম সৈয়দ বেলায়েত হোসেন,
চরমোনাই কওমী মাদ্রাসা,
চরমোনাই,
বরিশাল।
- ৯৬। মোঃ ওমর আলী জিহাদী,
পিতাঃ মোঃ আনহার আলী শেখ,
গ্রামঃ ডুমুরিয়া,
পোঃ সাজিয়াড়া, খুলনা।
- ৯৭। মুহাম্মাদ হাবিবুল্লাহ বাহার,
পিতাঃ মুহাঃ রমজুমিয়া,
খাদেম মিল্লাত মসজিদ,
গ্রাম ও পোঃ ধর্মপুর,
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
- ৯৮। মোঃ রাসেদুল ইসলাম (রাসু),
পিতাঃ মোঃ বিল্লাল মিয়া,
গওহরভাংগা খাদেমুল ইসলাম
মাদ্রাসা,
টুণগিপাড়া, গোপালগঞ্জ।
- ৯৯। মোঃ মিজানুর রহমান,
পিতাঃ মোঃ আবুল কালাম,
জামেয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া,
লালখান বাজার,
দামপাড়া, চট্টগ্রাম।
- ১০০। চৌধুরী মুহাম্মদ মুছা ইবনে
ইজহারুল ইসলাম,
পিতাঃ মুফতী মুহাম্মদ ইজহারুল
ইসলাম,
জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া,
লালখানবাজার,
দামপাড়া, চট্টগ্রাম।
- ১০১। মোঃ ইকবাল হুসাইন (বুলবুলি),
পিতাঃ মোঃ নাহিম উদ্দিন,
গ্রামঃ বুনারাবাদ,
পোঃ গরিয়ার ডাঙ্গা,
বড়িয়াখাটা, খুলনা।

১০২। মোঃ জাকির হোসেন (জুয়েল),
পিতাঃ মোঃ ইয়াসিন মণ্ডল,
সালতিনগর, মাটির মসজিদ লেন,
বগুড়া।

১০৩। সাইফুদ্দীন ইবনে মোঃ মোস্তাফা,
পিতাঃ মাওলানা মোঃ সাইফুদ্দীন,
মালতিনগর, মাটির মসজিদ লেন,
বগুড়া।

১০৪। মোঃ কবিরুল ইসলাম,
পিতাঃ মাওঃ মোঃ সেরাদুল ইসলাম,
সাংঃ গোপালপুর, পোঃ
কেডিগোপালপুর,
থানাঃ কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

১০৫। মোঃ মোশাররফ ইবনে আঃ রাহেক,
পিতাঃ মোঃ আঃ রাহেক শেখ,
বাশবাড়িয়া মাদ্রাসা,
পোঃ বনখনিয়া, থানাঃ টুঙ্গিপাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১০৬। মোঃ ফখরুল আলম (ছাত্র দারুল
মাআরিফ)
পিতাঃ মোঃ মোঃ বাকী বিল্লাহ,
প্রবর্ত্তেঃ আমজাদ হোসেন,
সাং থমানুরী খামার বাড়ী,
পোঃ ঘনিয়া,
থানাঃ ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

১০৭। মোঃ আঃ আল মাসউদ,
পিতাঃ ফজলুর রহমান,
বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিঃ
পোঃ সোনালী জুট মিল্স লিঃ
শিরমনি, খুলনা।

১০৮। মোঃ আবু সাঈদ সরদার,
পিতাঃ আব্দুর রশীদ সরদার,
গ্রামঃ শুয়াডহরী, (মুজাহিদপাড়া)
পোঃ গোশাইবাড়ী,
থানাঃ ধুনট, বগুড়া।

১০৯। মোঃ মনির হুসেন (মনি)
পিতাঃ মোঃ হাবিবুল্লাহ,
মধ্যবাডা মেফতাহল উলুম মাদ্রাসা,
শুলশান, ঢাকা-১২১২।

১১০। মোঃ আব্দুল আউয়াল,
পিতাঃ মোঃ ইসহাক আলী,
জামেয়া তওকুলিয়া ব্রেদা,
পোঃ হাজিগঞ্জ বাজার, সিলেট সদর।

১১১। মোহাম্মদ মফিজুর রহমান,
পিতাঃ মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান,
গ্রামঃ মির্জাপুর, পোঃ বখতারমুন্সী,
থানাঃ সোনাগাজী, ফেনী।

১১২। মোঃ হীন ইসলাম,
পিতাঃ সিরাজুল ইসলাম,
গ্রামঃ পশ্চিম কাটেকা,
তেরখাদা, খুলনা।

১১৩। মোঃ শহিদুল ইসলাম (খলীল),
পিতাঃ মোজাহার আলী,
গ্রামঃ সাগাটিয়া দঃপাড়া,
পোঃ নাড়িয়া মালাহাট,
গাবতলী, বগুড়া।

১১৪। মোঃ আলী আহমদ সিরাজী,
পিতাঃ মোঃ লাল মিয়া সরদার,
গ্রামঃ শিলাউর,
পোঃ হাবলাউচ্ছ, বি, বাড়ীয়া।

১১৫। মোঃ সালাহুদ্দীন,
পিতাঃ মোঃ জমির উদ্দীন,
গ্রামঃ লালপুর, পোঃ ছয়সুতী,
থানাঃ কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।

১১৬। মোঃ কাওহার আলী খান,
পিতাঃ আলতাফ হোসেন,
গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা,
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

১১৭। হাঃ মোঃ শামছুল হক (শামীম)
পিতাঃ মাওঃ মোঃ আঃ আউয়াল,
গ্রাম ও পোঃ মাটিচাংগা,
থানাঃ নাপিরপুর, পিরোজপুর।

১১৮। মোঃ আবুল বাশার নাজিরী,
পিতাঃ মাওঃ আঃ মোস্তাদের সাহেব,
আল জামেয়াতুল আরাবিয়াতুল
ইসলামিয়া, গাংনী, পোঃ পাকগাংনী,
থানাঃ মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

১১৯। মোঃ মনজুরুল আলম,
পিতাঃ মোহাম্মদ হোসাইন,
গ্রাম ও পোঃ বারবকিয়া,
চকরিয়া, কক্সবাজার

১২০। মোঃ আঃ রহমান জিহাদী,
পিতাঃ মরহুম মোঃ নূরুল হোসেন (মিনা),
গ্রামঃ ছয়বরিয়া, পোঃ নিমাখালী,
শালিখা, মাগুরা।

নবীন মুজাহিদদের বাকী সকল নাম-
ঠিকানা আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

- পরিচালক

নবীন মুজাহিদদের সদস্য কুপন

নাম ----- বয়স -----
পিতা ----- শ্রেণী -----
পূর্ণ ঠিকানা -----

আমার বয়স ১৮ বছরের কম। আমি এই পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। নবীন মুজাহিদদের কাফেলায় সদস্য হতে আগ্রহী। কুরআনের আলোকে জীবন গড়তে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই পত্রিকার জন্য প্রতি মাসে অন্তত একজন করে পাঠক সংগ্রহ করব।

স্বাক্ষর

এই কুপনটি কেটে পূরণ করে দুই টাকার অব্যবহৃত ডাক টিকেট সহ আমাদের ঠিকানায় পাঠালে আমরা তাকে নবীন মুজাহিদদের সদস্য করে নিবে।

• মোঃ ফিরোজ আহমাদ,
বাঁশবাড়িয়া মাদ্রাসা,
বনবনিয়া, পিরোজপুর,

হী ভাই, জাগো মুজাহিদে প্রকাশিত আফগান জিহাদ ভিত্তিক উপন্যাসটি বই আকারে আপনাদের হাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছে আছে, সাধ আছে। কিন্তু সাধা ও সীমিত সামর্থ্যের কারণে হয়ত এখনই হচ্ছে না। অপেক্ষা করুন। আপনার প্রিয় মুসাকে আপনার হাতেই তুলে দিব। এ দেশের প্রতি ঘরে ঘরে তৈরী করতে হবে মুসার মত খোদার পথে দৃঢ় প্রত্যয়ী লক্ষ লক্ষ যুবক। আপনি তাদের একজন—যারা সর্বদা মিথ্যার মুকাবিলায় সত্যের নিশান সমুদ্রত রাখবে জীবনের সব কিছু বিনিময়ে।

• সৈয়দ এরশাদ উল্লাহ,
ভুজপুর, ফটিকছড়ি,
চট্টগ্রাম।

আমাদের সার্কুলেশন বিভাগে পুরানো কপি সরাবরাহের ব্যবস্থা আছে। এখনও আমাদের কাছে এ পর্যন্ত প্রকাশিত সবকপি কম-বেশী মণ্ডলুদ রয়েছে। এক সাথে চার কপির বেশী ক্রয় করলে প্রতি কপির মূল্য হবে পাঁচ টাকা। এ ক্ষেত্রে ডাক খরচ আপনাকে বহন করতে হবে। যদি নয় কপির বেশী ক্রয় করতে চান তখন ডাক খরচ আমরাই বহন করব। খুচরা প্রতি কপির মূল্য পাঁচ টাকা।

লেখার মূল্য অর্থ দ্বারা শোধ হয় না। অর্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোন জিনী কাজ করাও ঠিক নয়। তবে পত্রিকার প্রাণ শক্তি হলো লেখক বৃন্দ। প্রাণকে সতেজ রাখা পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নৈতিক দায়িত্ব। এই নৈতিক দায়িত্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট।

আপনি সুপরিচিত একটি রাজনৈতিক দলকে নির্দিষ্ট করে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে তার প্রধান্য প্রমাণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে আমাদেরকে মন্তব্য করতে চলেছেন। শুনুন:

প্রথমত আমরা বর্তমান প্রচলিত তথাকথিত গণতন্ত্র শব্দযুক্ত সবধরনের দর্শনের বিরোধী। এসব রাজনীতির সাথে আমরা জড়িত হতে চাইনা। তবে হকপন্থী সব দল ও মতকে আমরা সমর্থন করি এবং আমরাও তাদের সহযোগিতা চাই। মিথ্যার মুকাবিলায় সত্যকে বিজয়ী করতে আমরা সব একজোট এ প্রসঙ্গে কারও দ্বিমতের অবকাশ নেই। ক্ষুদ্র মতভেদ এবং দলীয় সঙ্গীর্ণতা কখনও যেন আমাদের বৃহত্তর ও জাতীয় স্বার্থের অন্তরায় না হয়। তবে কোন কোন দলের সাথে হক্কানী আলিমদের ব্যাপক আলোচিত মতভেদের বিষয়গুলোর যৌক্তিক কারণে সংশোধন চাই। যে বিষয়টি আমাদের জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

• এস, এম, রুহুল আমীন,
গওহর ডাক্ষা মাদ্রাসা,
গোপালগঞ্জ।

আপনার প্রিয় কলাম 'আমার দেশের চালচিত্র' এবং প্রিয় কলামিস্ট ফারুক হোসাইন খাঁ'রক আপনায় সালাম, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা পৌছে দিলাম। তাঁর পক্ষ থেকে আপনিও গ্রহন করুন সালাম ও শুভেচ্ছা।

• মোঃ মুনিরুল ইসলাম,
হাটহাজারী মাদ্রাসা,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

গত সেপ্টেম্বর মাসে "বলতে পারো" এর উত্তর দিয়ে ভিত্তীয় স্থানে বিজয়ী হয়েও আপনি পুরস্কারের পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন। আপনার ঠিকানা পত্রিকা পাঠান হয়েছে, তা আপনি নিশ্চয়ই

আমাদের কি দোষ?

একটি খামে আপনি একাধিক বিষয়ে ও বিভাগে লেখা পাঠাতে পারেন। তবে প্রতিটি লেখার পায়ে বিভাগের উল্লেখ বাধ্যনীয়। মনে রাখবেন, প্রয়োজনের বেলায় এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে একবারে দুটির বেশী প্রশ্ন একসাথে গ্রহণযোগ্য নয়। এখন থেকে এই পত্রিকা প্রতি মাসের একবারে শুরুতে আপনার হাতে পৌছবে বলে আশা করি। এই ব্যাপারে আপনাদেরকে আর কষ্ট দেয়ার ইচ্ছে নেই। আপনাদের কষ্ট দিয়ে কি আমাদের সুখ হবে? পত্রিকাসহ সব ব্যাপারে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা চাই।

• এম, এ, জামান,
কচুয়া মাদ্রাসা,
কচুয়া, চাঁদপুর।

নবীন মুজাহিদদের পাঠ্যটি পত্রিকা প্রকাশের শুরু থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। পত্রিকায় এই বিভাগটি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে কেউ এককভাবে কৃতিত্বের দাবীদার নয়। তবে আপনার পরিচালক ভাইয়ার একটা নির্দিষ্ট পরিচয় আছে। প্রথমে এই পাঠ্যটির নাম ছিলো 'নবীনদের পাঠ্য'। পরে নাম রাখা হয় 'নবীন মুজাহিদদের পাঠ্য' যে নামটি তোমাদের সবার কাছে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। তবে এই নামটি নির্বাচনের ব্যাপারে একজন অবশ্যই কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। তবে এদের নাম জানার মধ্যে আপনার ইশ্বম বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই।

আঠার বছর বয়সের কম যে কোন কিশোর যুবক 'বলতে পারো' এর উত্তর পাঠাতে পারবে। এ জন্য এই পাঠ্যের সদস্য হওয়া জরুরী নয়।

• আবলাকুর রহমান চৌধুরী,
গ্রাম ও পোঃ মোজারপুর,
সিলেট।

হী, বোসনিয়া ও কাশ্মীরে মুসলমানদের সাথে কাফির মুশরিকদের সশস্ত্র জিহাদ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া আরও বহু দেশে মুজাহিদরা স্বাধীনতা অর্জন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষে সরকার ও বিরোধী বাতিল শক্তির মুকাবিলায় সশস্ত্র লড়াই করছে। আপনি নিজ দায়িত্বে তাদের সাথে মিলে কীধে কীধে রেখে অবশ্যই জিহাদ করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। এ জন্য সুন্দর চেহারা, বড় শিক্ষিত হওয়ার প্রশ্ন অবাস্তব বরং এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ইমামানী বল ও জাগ্রত সহমর্মিতাবোধ। অতপর প্রয়োজন রাখরচার জন্য অর্থের।

• মোহাম্মাদ আলমগীর,
দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া,
আমিরাবাদ চট্টগ্রাম।

'আমার দেশের চালচিত্র' কলামের বরাতে আপনি লিখেছেনঃ কবি সুফিয়া কামাল তার মেয়েকে হিন্দু ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছেন এবং শামসুর রহমান ছেলের জন্য হিন্দু মেয়ে এনেছেন—এসব ঘটনা সত্য। তবে ফেরদৌসী মজুমদারসহ এদের সবার ঠিকানা এই মুহূর্তে সংগ্রহে না থাকায় আপনাকে জানাতে না পারার জন্য দুঃখিত।

• মোঃ জাহাঙ্গীর,
দারুল উলুম মাদ্রাসা,
খুলনা।

নবীন মুজাহিদদের পাঠ্য একবার তোমাদের লেখা প্রবন্ধ, কবিতা, ছোট গল্প, ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি ছাপার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি নয় বরং ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছিলো। এখনও সে ইচ্ছা বহাল আছে। তোমরা লেখা

বিশ্বাপী মুজাহিদেব তৎপরতা

ভারতের অর্থনীতিতে ধ্বংস আসন্ন

ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের আমেরিকান সেন্টারের সেক্রেটারী গোলাম নবী ফাও বলেছেন যে, "কাশ্মীরে বর্তমানে ভারতের ৫ লক্ষ সৈন্য রয়েছে। বিদ্রোহ দমন অভিযানে তাদের ব্যয় নির্বাহে ভারতের প্রতিদিন ১৮ কোটি রুপি খরচ হচ্ছে। এ হারে ব্যয় হতে থাকলে শীঘ্রই ভারতের অর্থনীতিতে একটা ধ্বংস নামবে।

সারাজোভায় ২৪ জন নিহত

সম্প্রতি বসনিয়ার রাজধানী সারাজোভায় সার্বীয় জানোয়ার বাহিনীর এক প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের ফলে ২৪ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েকজন গর্ভবতী মহিলাও রয়েছে।

আলজেরিয়ায় ২জন শহীদ

আলজেরিয়ার ২ জন মুসলিম মুজাহিদ নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে এক বন্দুক যুদ্ধে মসজিদের ভিতর শহীদ হয়েছে। বোটি বউ আফরেদি শহরের উক্ত সংঘর্ষে ২ জন পুলিশ ও নিহত হয়েছে।

বোম্বেতে দাঙ্গায় ৬শত নিহত

বাবারী মসজিদ ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় ভারতের বোম্বে শহরের ৬ শতাধিক লোক নিহত হয়েছে। এর অধিকাংশই মুসলমান এবং তারা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। দাঙ্গা চলাকালিন সময়ের পুলিশের রেডিও বার্তার এক গোপন রেকর্ড থেকে জানা গেছে যে দাঙ্গা পুলিশ হিন্দু দাঙ্গাকারীদের সহযোগিতা করেছে এবং দাঙ্গার সময় তারা মুসলমানদের লক্ষ করেছে কেবল গুলিছুড়েছে।

হাঁপানী, বাত, প্যারালাইসিস, চর্মরোগ, এন্ডালার্জি

- ☆ গ্যাস্ট্রিক, আলচার, গলা ও বুকজ্বালা, লিভারদোষ, রক্ত আমাশয়, পুরাতন আমের দোষ।
- ☆ প্রস্রাবে ক্ষয়, ঘনঘন প্রস্রাব, (ডায়াবেটিস), প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া, কিটকিট কামড় মারা
- ☆ স্বপ্ন দোষ, শুক্র তারল্য, পুরুষত্বহীনতা, লিঙ্গে দোষ।
- ☆ সিকিলিস, গনোরিয়া, প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া রক্ত পুঁজ যাওয়া, ধ্বজডংগ।

স্ত্রী ব্যাধি

শ্বেত প্রদর (লিকুরিয়া), রক্তক প্রদর, বাধক বেদনা, যে কোন কারণে মাসিক বন্ধ, সূতিকা, শুকনো সূতি, নারিত্বহীনতা, ১০/১৫ বৎসর বিবাহ হয়েছে আজও সন্তান হয় নাই তাদের সন্তান লাভ।

- ☆ অর্শ, গেজ, ভগন্দর, শ্বেতী, সুলী, ব্রন, মেস্তা, কানপাঁকা, কানে কম শোনা, চক্ষুরোগ, মস্তিষ্কের দুর্বলতা, মৃগী, পাগল, অকাল চুল পাকা ও উঠা ইত্যাদিতে পূর্ণ নিশ্চয়তা।

উপরে বর্ণিত রোগে যারা আক্রান্ত তাদের সেবা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রথম শ্রেণীর হাকিম হাফেজ মেহবাহ উদ্দিনের সহিত নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

যোগাযোগ:

হাকিম হাফেজ মেহবাহ উদ্দিন

গওহার ইউনানী ঔষধালয়

সেকশন-১২, ব্লক ডি (পানির ট্যাংকি সংলগ্ন)

মিরপুর, ঢাকা-১২১২

বিঃ দ্রঃ মিরপুর সাড়ে এগার বাস স্ট্যাণ্ডে নেমে সোজা পূর্বদিকে পানির ট্যাংকি সংলগ্ন।

ইউনিক ↑ টেইলার্স

৫০, বায়তুল মোকাররম, ২য় তলা, ঢাকা

অত্যাধুনিক ও
রুচিসম্মত ডিজাইনের
খাঁটি গিনি সোনার



অলংকার
প্রস্তুতকারক
ও বিক্রেতা
ইউনিক
জুয়েলার্স

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

৪৩, বায়তুল মোকাররম (২য়তলা),

ঢাকা—১০০০ ফোন—২৪৩২৭৩

সহযোগী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইউনিক ওয়াচ



সর্বপ্রকার ঘড়ি বিক্রয় ও মেরামত করা হয়

৩১, বায়তুল মোকাররম (দোতলা), ঢাকা

ফোন : ২৩২৬৮০ বাসা : ৪১৮৩৭৯

কোণী বিবরণী পাঠালে দেশে ও বিদেশে যত্নসহকারে ডাকযোগে ঈশ্বর পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সূতী, স্যানডার্স,
নায়লন ও টারকিস মোজা প্রস্তুতকারক



Chand
SOCKS



চান্দ হোসিয়ারী মিলস

৩০, শাখারী নগর লেন, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪